দাম : ষোলো টাকা

আধুনিক সমাজের
অতিপ্রয়োজনীয় শর্ত
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
— পৃঃ ১৬

স্বস্তিকা

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
গ্রহণে মুসলমান সমাজের
ভিন্ন সুর কেন?
— পৃঃ ২৩

৭৫ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ২৬ ডিসেম্বর, ২০২২।। ১০ পৌষ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
কেন জরুরি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১০ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৬ ডিসেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

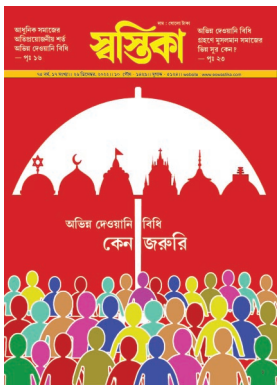

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মৃত্যুঘণ্টা না বাজালেও পোড়া নগরে মমতার দেবালয় বাঁচবে না □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

একশো দিনের কাজের সত্যি-মিথ্যে □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

বিজেপি দল থেকে শিক্ষণীয় ছ'টি বিষয় □ চেতন ভগত □ ৮

সেনাকে অপমান করে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে বিরোধীরা □ বিশ্বামিত্র □ ১০

আগামীদিনে আর্থিক উন্নয়নে ভারতবর্ষ বিশ্বকে পথ দেখাবে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১১

ওড়িশা পারে অথচ আমরা পারি না □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৩

পরিবেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখনও সচেতন নয় □ শেখর সেনগুপ্ত □ ১৫

আধুনিক সমাজের অতি প্রয়োজনীয় শর্ত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি □ ড. বিমল শঙ্কর নন্দ □ ১৬

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গ্রহণে মুসলমান সমাজের ভিন্ন সুর কেন? □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৩

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে হাঁটু কাঁপছে বিরোধীদের □ নিখিল চিত্রকর □ ২৬

হিন্দুধর্মের অমৃত অভিযাত্রা □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

জনজাতি যোদ্ধাদের কাছে ভারত চিরকৃতজ্ঞ □ কৌশিক রায় □ ৩৪

দুর্বলদের জন্য বাপীদার কোচিংই ভরসা □ কুণাল চট্টোপাধ্যায় □ ৩৫

শাস্ত্রচর্চা গুরুত্বপূর্ণ তবে অস্ত্রটাও শাণিত থাকা দরকার □ উত্তম মণ্ডল □ ৩৬

বাম জেহাদিদের তথাকথিত উত্তরপুরুষ তিতুমির □ দীপক খাঁ □ ৪৩

বিশ্ব মানচিত্রে টিকে থাকবে কিনা পাকিস্তানকেই ঠিক করতে হবে □ কৃষ্ণচন্দ্র দে □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২ জানুয়ারি
২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২ জানুয়ারি
২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাড়ছে ফুসফুসের অসুখ

শীতকালে দূষণ বাড়ে। এর ফলে বেড়ে যায় ফুসফুসের নানারকম অসুখ। বিশেষ করে পেশাগত কারণে যাদের দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকতে হয় তারা আক্রান্ত হচ্ছেন সি. ও. পি. ডি. জাতীয় অসুখে। বাদ যাচ্ছে না বাচ্চারাও। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, মেট্রো শহরগুলিতে বাড়ছে বাচ্চাদের হাঁপানি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এই বিষয়ে আলোচনা। বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা জানাবেন তাঁদের অভিমত।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশের একরূপতার একটি শর্ত অভিন্ন আইন প্রণয়ন

একজাতি এক প্রাণ শুধু কথার কথা নহে। শুধু সভা সমিমিতে গান গাহিলেই ইহার বাস্তবায়ন হইবে না। ইহার জন্য দেশকে মা জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দেশকে মা জ্ঞান করিলেই সমুদয় দেশবাসী ভ্রাতৃজ্ঞানে সহাবস্থান করিতে পারে। ভ্রাতৃস্বরূপ হইবার প্রধান শর্তই হইল দেশকে মাতৃজ্ঞানে মান্য করা। ভূমির প্রতি মাতৃভাব আরোপ ইদানীংকালের কোনো ধারণা নহে। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের মধ্যেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাকেই রাষ্ট্র বলা হইয়াছে। এই রাষ্ট্রবোধই ভারতবাসীকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। বৈদেশিক শাসনকালে দেশ পরাধীন হইলেও দেশবাসীর রাষ্ট্রবোধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিদেশি শাসকরা বিশেষ করিয়া চতুর ইংরাজ ভারতবর্ষকে চিরকাল অবদমিত রাখিবার জন্য বিভেদনীতি অবলম্বন করিয়া জাতিবিদ্বেষে জর্জরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহার জন্য তাহারা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের তৎকালীন শাসকবর্গও ব্রিটিশের বিভেদনীতিকে শুধুমাত্র বহালই রাখেন নাই বরং পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এক জাতি এক প্রাণ, ইহা শুধুমাত্র তাহাদের রাজনৈতিক স্লোগানের মধ্যেই থাকিয়াছে। দীর্ঘদিন তাহারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সমগ্র দেশে একরূপতা আনয়ন করিবার কোনোরূপ প্রচেষ্টা করেন নাই। যাহারা ইহা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক অভিধায় ভূষিত করা হইয়াছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথমাবধি ভারতবর্ষে একরূপতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাতে বহুলাংশে সফলও হইয়াছে।

সমগ্র দেশে একরূপতা আনিবার অনিবার্য শর্ত হইল সমগ্র দেশবাসীর জন্য একই রূপ আইন প্রণয়ন। ইহারই জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের উচ্চকক্ষে একজন সাংসদ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের জন্য একটি ব্যক্তিগত বিল পেশ করিয়াছেন। আর তাহাতেই বিরোধীরা গেল গেল রব তুলিয়াছেন। আসলে দেশের রাজনৈতিক বিরোধীরা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহাদের বক্তব্য, ভারতকে এক রাষ্ট্র হইতে হইলেই একই প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে হইবে তাহার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। বস্তুত রাজনৈতিক বিরোধীরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বৈদেশিক শাসকরা ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য পদানত রাখিবার জন্য যে কোনো কৌশল তাহা যতই গর্হিত হউক না কেন, ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের পূর্বতন শাসকরা ১৯৩৭ সালের শরিয়া আইন দীর্ঘদিন বহাল রাখিয়াছে। শুধু শরিয়াই নহে, ব্রিটিশ আইনও নহে, দেশের কোথাও কোথাও পর্তুগিজ ও ফরাসি আইনও চালু রাখিয়াছে। বস্তুত, রাজনৈতিক বিরোধীরা ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্যই বিভেদনীতি চালু রাখিয়াছেন তাহা পরিষ্কার। সুখের বিষয় হইল, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন উচ্চ আদালতও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করিবার কথা বলিতেছেন। ইতিপূর্বে সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের পক্ষে সহমত পোষণ করিয়াছে দিল্লি হাইকোর্ট। তাহাদের বক্তব্য, বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইনের সংঘাতের ফলে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সমস্যায় পড়িতে হইতেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টও জানাইয়াছে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি খুবই প্রয়োজনীয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে আবশ্যিক করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। রাজনৈতিক বিরোধীরা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার পছন্দ অনুসারে ধর্মমত গ্রহণ, রীতিনীতি অনুসরণ ও প্রচারের অধিকার দিয়াছে। দিয়াছে ধর্মীয় বিষয়ে সাম্যের অধিকার। সংবিধান প্রণেতারা চাহিয়াছিলেন, ধর্মমত বিভিন্ন রকমের হউক না কেন, কিন্তু দেশের আইন হইতে হইবে এক ও অভিন্ন। সংবিধানের একটি ধারায় বলাও হইয়াছে, সরকারকে এক সময় সমস্ত নাগরিকের জন্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রণয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাহাই করিতে চলিয়াছে আর তাহাতেই চিৎকার শুরু হইয়াছে। আসাদুদ্দিন ওয়াইসিদের আর্ত চিৎকারের অর্থ বোধগম্য হয়, কিন্তু দেশের মানুষকে একাত্ম করিয়া তুলিবার এই শুভ প্রচেষ্টায় বিরোধীদের বিরোধিতা সর্বপ্রকার চিন্তার অতীত। দেশের মঙ্গলের কথা তাহারা আর কবে বুঝিবেন? তাহারা না বুঝিলেও দেশের মানুষ বুঝিয়াছেন কাহাদের হাতে এবং কাহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে।

সুভাষিতম্

শস্ত্রৈর্হতাস্তু রিপবো ন হতা ভবন্তি প্রজ্ঞাহতাশ্চ নিতরাং সুহতা ভবন্তি।
শস্ত্রং নিহন্তি পুরুষস্য শরীরমেকং প্রজ্ঞা কলাং চ বিভবং যশশ্চ হন্তি।।

শস্ত্রের দ্বারা শত্রুদের আঘাত করলেও তাদের প্রকৃত হনন তখনই সম্ভব, যখন তাদের বুদ্ধিবলকে পরাস্ত করা হয়। কারণ শস্ত্রের দ্বারা কেবল তাদের শরীর বিনষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধি ধ্বংস হলে তাদের যশ, কীর্তি ও সম্পদ সবই নষ্ট হয়ে যায়।

মৃত্যুঘণ্টা না বাজলেও পোড়া নগরে মমতার দেবালয় বাঁচবে না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ডিসেম্বর সনদ হেঁকে রাজ্যের বিজেপি নেতারা তৃণমূল সরকারের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। এখন অবধি তেমন কিছু হয়নি। তবে হবে না এমনটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। প্রধানভাবে তৃণমূলের যুবরাজ সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজ্যময় নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাজি রেখে ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা করছেন। তবে অভিষেক আর তাঁর পিসি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিলক্ষণ জানেন তাদের তৈরি মায়া নগর পুড়তে চলেছে। সেই সঙ্গে সযত্নে তৈরি মায়া দেবালয়ও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেইদিন খুব বেশি দূরে নেই। যতই মাপজোকের রাজনীতি তারা করার চেষ্টা করুন না কেন। তা ব্যর্থ হবেই। দোষীরা রেহাই পাবে না। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সিপিএমের এক নেতা ঠাট্টা করে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হতে গিয়ে মমতা দিদি থেকে দিদিমা হয়ে যাবেন। তাঁর সৌভাগ্য মমতার মুখ্যমন্ত্রিত্ব তাঁকে দেখে যেতে হয়নি। তার আগেই তিনি প্রয়াত হন। তৃণমূলের নেতারাও একইরকমভাবে বলা চলে খানিকটা বোকার মতো ভাবছেন রাজ্য থেকে তৃণমূল উচ্ছেদ হবে না।

ভাইয়েরা ভাবছে মমতা দিদি থেকে মহাদিদি আর তারপর ভারতের রাজনীতির বড়োদিদি হয়ে উঠবেন। রাজ্য বিজেপি সব নেতাই কেন্দ্রীয় নেতাদের মুখাপেক্ষী। তাই অমিত শাহ যথার্থ ক্ষোভের সুরে বলেছেন বিধানসভা ভোটে বিজেপির ২ কোটি ২৯ লক্ষ ভোট কোথায় গেল? বলতে বাধা নেই এটা আমি আজ ন' মাস ধরে লিখে বা বলে আসছি। তারা বেশ কয়েকটি খুচরো ভোট হেরে গিয়েছে। সে সুযোগ নিয়েছে মমতা আর তার প্রশাসন।

সিপিএম আর কংগ্রেস নিভে যাওয়া প্রদীপ। শাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন মানুষ যেন বামেদের দিকে না ঝোঁকে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সেটা তৃণমূলের ক্ষমতায় থাকার থেকেও মারাত্মক হবে। যে ভাবেই হোক তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। লোকসভা ভোটে বাম দুর্দশায় সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাট জানিয়েছিলেন বামের ভোট কীভাবে রামে গিয়ে তাদের সর্বনাশ এনেছিল।

বিধানসভা ভোটে বামেরা কুল গোত্র সবই খোয়ায়। ২০২৩-এর মাঝামাঝি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৪ হাজার আসনে ভোট। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে তৃণমূল আনুমানিক ৩০ হাজার আসনে এগিয়ে রয়েছে। অনেকে বলছে এটাই নাকি তৃণমূল সরকারের মার্কার বা ভবিষ্যৎ। ২০০৮-এর পঞ্চায়েত ভোট জানিয়েছিল সিপিএমের বিদায় আসন্ন। দুর্নীতির দেওয়ালে তৃণমূলের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তারা মরণকালে হরিনাম করছে। তাই নিজের দলের আর প্রশাসনের দুর্বলতা তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছেন অভিষেক। ভাবটা যদি মানুষ আহা বা বেচারা করে ক্ষমা করে দেন। রাজ্য জুড়ে মমতা প্রশাসনের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। অভিষেকের বক্তৃতা বা অন্তঃশুদ্ধির ভাষণ যে অন্তঃসারশূন্য আর হাস্যকর মানুষ তা জানেন। তাই সহজে বাঁচানো যাবে না। হরতি নিমেষাৎ কালসর্বম্। □

একশো দিনের কাজের সত্যি-মিথ্যে

দাবিদারেষু দিদি,

একশো দিনের কাজ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগের কোনও ব্যাখ্যা এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয়নি। তাই রাজ্যের টাকা আটকে আছে। সংসদে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শুধু তাই নয়, লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ তোলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পরে রাজ্যে হামলা, লুট, ধর্ষণ, বিজেপি কর্মীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। অর্থমন্ত্রীর এমন বলাটাকে আমি একদমই সমর্থন করতে পারছি না। সত্যি কথাও কি এমন করে সংসদে বলা যায়? দিদি, বাংলার প্রতি এই অপমান মানতে পারছি না।

আপনি অনেক দিন ধরেই টাকা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। আপনার দলও করেছে। সবটাই রাজনৈতিক স্তরে। সরকারি ভাবে কী হয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু অর্থমন্ত্রী সেটাই জানিয়ে দিলেন। এর পরে তো আর কিছু বলারই থাকে না। সীতারামন বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের সাংসদরা ১০০ দিনের কাজে টাকা দেওয়া হচ্ছে না বলে উদ্বেগ জানিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তিদের থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরেই গত মার্চ থেকে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে। রোজগার গ্যারান্টি আইন অনুযায়ী, অভিযোগ পেলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত টাকা ছাড়া বন্ধ রাখবে।' এটুকু বলেই থেমে যাননি সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলতে থাকেন, 'সংবাদপত্রে টাকার অপব্যবহার নিয়ে রিপোর্টের মধ্যে যাচ্ছিই না। কিন্তু আমরা রাজ্য সরকারের কাছে ওই সব অভিযোগ পাঠিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখনও তা পাওয়া যায়নি।'

আপনার সাংসদরা অবশ্য চুপ করে থাকেননি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, সব বিতর্ক মিটে গিয়েছে। এবার কেন্দ্রের টাকা ছাড়া উচিত। কিন্তু অর্থমন্ত্রী গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্যের ভিত্তিতেই বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে সঠিক হিসেব না দেওয়ার ব্যাখ্যা মেলেনি বলেই টাকা আটকে রাখা হয়েছে।

কিন্তু দিদি সত্যিটা কী? সত্যিই কি হিসাব দেওয়া হয়নি? গত আগস্টে আপনি নিজেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একশো দিনের কাজে বকেয়া টাকা চেয়ে দরবার করেছিলেন। আপনার দাবি মতো রাজ্যের এই খাতে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার বেশি পাওনা। যদিও আপনার সংসদেরা বলছেন, এখন বকেয়া বেড়ে হয়েছে ৭,৩০০ কোটি টাকা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, রাজ্যের পাওনা ৩,২০০ কোটি টাকার মতো। এই প্রকল্পে যে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে সেটাও সংসদে জানিয়েছে কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। ওই মন্ত্রকের পক্ষে প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজে অভিযোগ পেয়ে রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার নয়ছয় হওয়া অর্থ উদ্ধার করেছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। ১১টি জেলা থেকে প্রায় ৫২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে। ১৯ লক্ষ টাকার বেশি।

> **গ্রামের গরিব মানুষ হকের টাকা পাচ্ছে না এটা ঠিক নয়। মেনে নিতে পারছি না। আপনি বলছেন, বিরোধী দলের সরকার বলে বিজেপি আটকে রেখেছে। কিন্তু দিদি অন্য কোনও রাজ্য থেকে তো এই অভিযোগ ওঠেনি! তা হলে? সত্যিটা বলুন।**

এই সব নিয়েই আমার প্রশ্ন, সত্যিটা কী? এত বেশি আসন নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন আপনি। আর তারপর থেকে এত অভিযোগ শুনতে আর ভালো লাগছে না। চাকরি বিক্রি থেকে গোরু, কয়লা পাচারের অভিযোগ শুনে আপনার ভাই হিসেবে লজ্জায় লাল হয়ে আছি। কিন্তু দিদি, গ্রামের গরিব মানুষ হকের টাকা পাচ্ছে না এটা ঠিক নয়। মেনে নিতে পারছি না। আপনি বলছেন, বিরোধী দলের সরকার বলে বিজেপি আটকে রেখেছে। কিন্তু দিদি অন্য কোনও রাজ্য থেকে তো এই অভিযোগ ওঠেনি! তা হলে? সত্যিটা বলুন না দিদি। দোহাই দিদি, সত্যিটা বলুন।

অতিথি কলম

চেতন ভগত

বিজেপি দল থেকে শিক্ষণীয় ছ'টি বিষয়

কিছু কিছু দূরদৃষ্টি যদি অসম্ভব বা অর্জন করা দুষ্কর বলে মনে হয় সেক্ষেত্রেও দূরদৃষ্টিহীন নেতাদের থেকে তা বেশি কাম্য। তাই বিজেপিকে পছন্দ না হলেও তার নিরন্তর জনবিশ্বাস অর্জনে সাফল্য ও জনতার অটুট সমর্থন এটা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে যে পৃথিবীর মাটিতে সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত রাজনৈতিক দলের নাম বিজেপি।

প্রত্যেক নাগরিকেরই নিশ্চয়ই অধিকার আছে বর্তমান ভারতে শাসক দলের নানাবিধ সমালোচনা করার। কিন্তু একইসঙ্গে তাদের কার্যধারা থেকে রাজনীতি ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ও কিছু কিছু রয়েছে। গত সপ্তাহে এই দলের সরকারের আট বছর পূর্ণ হলো। এর মধ্যেই দলটি গুজরাটের রাজ্য নির্বাচনে বিশাল জয় পেল। তারা খুব অল্প ব্যবধানে কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হারিয়েছে হিমাচল প্রদেশে এটাও ঠিক কিন্তু গুজরাট নির্বাচনে জয়ের অভিঘাত নিশ্চিতভাবেই দেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতির ওপর পড়বে। গুজরাট সংসদে ২৬ জন সাংসদ পাঠায় সেখানে হিমাচল প্রদেশের সংখ্যা চার।

এটিও লক্ষ্য করার যে হিমাচলে বিজেপি হেরেছে ১ শতাংশেরও কম ভোটের ব্যবধানে। অন্যদিকে গুজরাটে বিজেপির ৫২ শতাংশ ভোট প্রাপ্তির বিপক্ষে কংগ্রেসের ২৭ শতাংশ তাদের একেবারে মুছে দিয়েছে। এখানে নতুন উদয় হওয়া আপ দলের তুলনামূলকভাবে ১৩ শতাংশ ভোট খারাপ নয়। তবু এখানেও বিজেপির পর্যাপ্ত প্রাধান্য ছিল। দুটি ঘটনাই দলের আট বছরের শাসন পূর্তির সময় ঘটল।

কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের শাসনকালের ২০০৪-১৪-এর ৮ বছরের পূর্তি ছিল ২০১২ সালে। ঠিক এই বছরেই দুর্নীতি বিতর্ক যা পরিণতিতে কংগ্রেস শাসনের বিপর্যয় ডেকে আনে তা চরম মাত্রায় উঠেছিল। জনগণ রাস্তায় নেমে এসেছিল কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসে থাকা এই দলের বিরুদ্ধে। বিপরীতে আজকের ৮ বছর ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের পর নির্বাচন জিতে চলেছে। অবশ্যই বিজেপি সব কিছুই জিতে ফেলেনি, সেটা তো ভালো লক্ষণ যে দেশের গণতন্ত্রটি রয়েছে সজীব। একইসঙ্গে এটাও প্রমাণ করে প্রত্যেকটি নির্বাচন জিততে গেলে তার জন্য আলাদা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করতে হবে। বিজেপি কিন্তু সেই চেষ্টাটাই করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয় পায়। তথ্য সন্ধান করে দেখা গেছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি সেখানে নির্বাচনী জয়ের হার ও জনপ্রিয়তার নিরিখে সমস্ত রাজনৈতিক দলের থেকে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। তাদের মতো নির্বাচনী সাফল্যের হার কোনো দেশেরই বাস্তবে নেই।

এই সূত্রে আমরা ক্ষমতার একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার যে প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে সেটি নিরীক্ষণ করব। একই সঙ্গে সরকার বিরোধী বহু বক্তব্যও শোনা যাচ্ছে। সরকারের কাজকর্ম নিয়ে এই উদ্বেগ ও ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন নিয়ে সমালোচনা থাকলেও আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই শাসনপর্বে তারা কতকগুলি অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে।

এমন একটি মিডিয়া সংক্রমণের যুগে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কারুর বিরোধিতা করার কোনো পরিকল্পনা অতি দ্রুত ছড়িয়ে দিয়ে বহু ক্ষেত্রে সাফল্যও পাওয়া যায়। সেখানেও ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় বিশ্বাস ও ভাবনার দেশে বিজেপি তার পক্ষে জন অভিমতের ইতিবাচক ধারা বজায় রেখেছে। অবশ্যই সকলে দলের মত ও আদর্শের সঙ্গে একমত না হলেও নির্বাচনী সাফল্য পেতে হলে যে গরিষ্ঠাংশের অনুকূল মতামত প্রয়োজন হয় তা বিজেপি সফলভাবে নিজের কাছে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যারই পরিণতি উপর্যুপুরি নির্বাচনী জয়। কোনো কারচুপি বা কৌশলে নয় অত্যন্ত অনুমোদিত পন্থায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি ভয়ংকর খারাপ কাজ করছে এমন একটা কোলাহল তোলার মধ্যে তারা কী কী সঠিক কাজ করছে বা করেছে সেই প্রশ্ন করতে অনেকেই ভুলে যাচ্ছে। এখানে ছটি বিষয়ের আমি উল্লেখ

করব যা অত্যন্ত সঠিকভাবে হয়েছে এবং যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলন করলে আমরাও সাফল্য পেতে পারি।

(১) সত্যিকারের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আবেগ— কথাতেই আছে সম্পূর্ণ মন প্রাণ নিবেদন করে কাজ করলে চূড়ান্ত ফলাফল মনোমতো ভাবে পাওয়া যায়। বিজেপির ক্ষেত্রে আপ্তবাক্যটি সত্য। শীর্ষ নেতৃত্ব ও তৃণমূল স্তরের নেতাদের মধ্যে তালমিল রেখে নির্বাচনী জয় পেয়ে সুশাসন কায়েম করার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বিরলদৃষ্ট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বহু বছর ধরে নাগাড়ে সাফল্য ধরে রাখার পরও ওই আবেগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দলের মধ্যে দেখা যায়নি। সাধারণত যেখানে ঔদ্ধত্য, শিথিলতা মাথাচাড়া দেওয়াটা অতি স্বাভাবিক। এই শিক্ষাটি আপামর জনসাধারণ নিতে পারেন। জীবনে সাফল্য পেলে সেই জায়গাটি নিয়েই সদা পরিতৃপ্ত থাকা উচিত নয় বা তাতেই আসক্তি জন্মানো ঠিক নয়। আরও এগোনো যায়।

(২) নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা— প্রত্যেকটি নির্বাচন এলেই সে সময় এখনও শয়ে শয়ে নির্বাচনী পদযাত্রা বা সভা করা হয়। বহু সময় আবহাওয়া ভালো থাকে না কেননা ভারতের মতো এত বড়ো দেশের জলবায়ু সদা সব জায়গায় একরকম থাকে না। বিজেপি-তে তুমি যত প্রবীণ হবে তোমার কাজ ততই বাড়বে উলটোটা নয় যে হালকা মেজাজে প্রবীণত্ব উপভোগ করবে। বিজেপির সাংগঠনিক মেশিনারি ২৪×৭ ঘণ্টা কাজ করতে অভ্যস্ত। জীবনের জন্য শিক্ষা এই যে তুমি যতই প্রতিভাবান বা ভাগ্যবান হিসেবে ইতিমধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখে থাকো না কেন কঠিন কাজ তোমাকে করে যেতেই হবে।

(৩) ছোটো ছোটো বিষয় নির্দিষ্ট করে অসাধারণ কর্মকুশলতা প্রদর্শন— স্বচ্ছ ভারত, উজ্বলা, প্রতি ঘরে জল, বিদ্যুৎ এই বিষয়গুলি শুনতে অতি সহজ সরল প্রকল্প মনে হলেও এগুলির সফল রূপায়ণ করতে পারলে মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। একবার ভাবুন সেই সমস্ত মানুষদের কথা যারা প্রথম নিজস্ব শৌচালয়, গ্যাসের সংযোগ বা ঘরের মধ্যে জলের প্রবাহ জীবনে দেখল। কিন্তু এগুলি সব আপনাকে দেওয়া হবে এমন চটকদারী ঘোষণা করার মতো রসালো কাজ খুবই সহজ কিন্তু এগুলির বাস্তব রূপায়ণ কঠিনতম কাজ। আজকের ভারতে এগুলির উপভোক্তা কোটি কোটি। সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর যে বিশাল একনিষ্ঠ সমর্থকমণ্ডলী তৈরি হয়েছে তারা কি এরা নয়? এ থেকে জীবনের শিক্ষা— ছোটো ছোটো লক্ষ্য স্থির করা ও তার সুপ্রয়োগ নিশ্চিত করা।

(৪) ভারতীয় মনস্তত্ত্বকে সঠিকভাবে বোঝা— বিজেপি ভোটারদের সবার থেকে এগিয়ে রাখে। তাদের অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। ভোটার কী ভাবছে বা তার কী ভাবা উচিত এর ওপর কোনো বিচার করে না। গড় ভারতীয়ের মানসিকতা কী তা যে কোনো ভোগ্যপণ্য বিক্রেতাদের মার্কেটিং বিভাগের অধিকর্তাদের বা মিডিয়া কর্তাদের তুলনায় বিজেপি ভালো বোঝে। এক্ষেত্রে জাতীয় গর্ববোধ, হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, দেশী জিনিসের প্রতি মমত্ববোধ বা মাতৃভাষা, কী কী দেশবাসীকে বেশি আকর্ষণ করে বা ভারতীয় নাগরিক কী নিয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় তা বিজেপি খুব ভালো জানে। বিশেষ করে ভারতবাসীর অনুভব সম্পর্কে দল সদা সজাগ থাকে। যে কারণেই এতদিন প্রশাসনের কর্তা হয়েও তাদের কান পাতা থাকে মাটিতে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের কোনো দলই এত নিবিড়ভাবে ভারতবাসীর অন্তরস্থ ভাবনাস্তরকে ধরতে পারেনি। জীবনের শিক্ষা পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় অনুধাবন করে সেই মতো কাজ করলে অভিষ্ট লক্ষ্য সাধন করা যায়।

(৫) বিশেষ বৌদ্ধিক স্তরের মানুষজনের অনুমোদন গ্রাহ্য না করা— আমাদের দেশে দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন থাকার ফলে আমাদের মনে একধরনের জটিল হীনম্যতা আছে। যে কারণে আমরা ইংরেজির এত কদর করি, ইংরেজিমনস্ক যাকে বলে anglicised বা যারা বেশি sophisticated অর্থাৎ আমজনতার মতো নয় তাদের নির্বিচারে সম্ভ্রমের চোখে দেখা। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এ সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই ইংরেজিতে করা প্রশংসা হিন্দিতে করা প্রশংসার থেকে বেশি মূল্যবান মনে করে। এটা অভিজ্ঞতায় দেখেছি। বিজেপির এই ধরনের কোনো হীনমন্যতা নেই। অবশ্যই নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্য মিডিয়া বা রাষ্ট্রনায়কৃ বিশ্বের কোনো বড়ো সংস্থা যখন কোনো মূল্যায়ন করে সেটা তারা বিবেচনা করে। কিন্তু তারা কখনই ভারতীয় anglicised বৌদ্ধিক ব্যক্তিদের মতামতকে গ্রহণযোগ্যতা দেয় না। পাশ্চাত্য ঘরানাপ্রেমী উন্নাসিক elite-দের বিরোধিতাকে গ্রাহ্য না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কীভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর বিশ্বাস অর্জন করা যায় এবং সর্বশেষে ভোটবাক্সে সমর্থনটির প্রতিফলন অর্জন করা যায় সে বিষয়ে যত্নবান থাকে।

(৬) জীবনের শিক্ষা— কোনো বৌদ্ধিক বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুমোদন না পেলেও নিজের অগ্রগতি ব্যাহত করো না। ভারতের দিকদর্শন— যতই আপাতভাবে অসম্ভব বা অসত্য প্রতিশ্রুতি মনে করা হোক না কেন দেশের সর্বোচ্চ নেতার যদি একটি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে যেমন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তিধর হয়ে ওঠা, বৃহত্তর অর্থনীতির বহর স্পর্শ করা বা সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠন করা বৃহত্তর দেশবাসী এটা চায়। তারা এরকম ভাবতে ভালোবাসে।

জীবন ও অন্যান্য দেশের পক্ষে শিক্ষা— কিছু কিছু দূরদৃষ্টি যদি অসম্ভব বা অর্জন করা দুষ্কর বলে মনে হয় সেক্ষেত্রেও দূরদৃষ্টিহীন নেতাদের থেকে তা বেশি কাম্য। তাই বিজেপিকে পছন্দ না হলেও তার নিরন্তর জনবিশ্বাস অর্জনে সাফল্য ও জনতার অটুট সমর্থন এটা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে যে পৃথিবীর মাটিতে সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত রাজনৈতিক দলের নাম বিজেপি। এটি একটি শিক্ষালয়।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতা রানিকুঠি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ভরত কুমার সুরানা গত ২০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। রেখে গেছেন তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের।

সেনাকে অপমান করে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে বিরোধীরা

ভারত চীন সংঘর্ষের আবহে পারদ চড়ছে জাতীয় রাজনীতিতেও। ঘটনা হলো, গত ৮ ডিসেম্বর রাতে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং প্রদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায় চীনা লালফৌজ। ঘটনাটা ভারতীয় সেনার নজরে এলে তারা আক্রমণ করে লালফৌজকে। ফলে পিছু হঠতে বাধ্য হয় চীনা সেনা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আরও শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসে। ভারতের সেনার সঙ্গে ফের সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনজন চীনা সেনাকে আটক করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, লালফৌজের অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন সেনা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তাড়ায় তাদের আউটপোস্টে ফিরে যায়। অভিযোগ সেখান থেকেই দুই রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে দু'দেশের সেনাকর্তারা ফ্ল্যাগমিটিঙে বসেন। ধৃত তিন চীন সেনাকে সীমান্ত পার করে ছেড়ে আসা হয়। কূটনৈতিকভাবেও পদক্ষেপ নেয় ভারত।

ভারতের দুর্ভাগ্য, চীনের এই চরিত্র গোটা দুনিয়া জানার পরও এনিয়ে দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতি হয়। সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের সময় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সংসদে বিবৃতি দিয়ে পুরো ঘটনার বর্ণনা করলেও বিরোধীরা বলছে সরকার কিছু একটা লুকোচ্ছে। পুরো সত্য ঘটনা প্রকাশ হতে দিচ্ছে না। রাহুল গান্ধী ১৬ ডিসেম্বর তাঁর 'ভারত জোড়ো' যাত্রার শততম দিন উপলক্ষ্যে জয়পুরে সাংবাদিক সম্মেলনে আবিষ্কার করেছেন চীনা সেনা নাকি ভারতীয় সেনাদের 'মারধর' করেছে। আর মোদী সরকার তা নাকি আড়াল করার চেষ্টা করছে। যদিও সংসদেই গত ২০ ডিসেম্বর সরকারের পক্ষে এর জবাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথার্থই বলেছিলেন, এটা ১৯৬২ সালের ভারত নয় যে চীন ভারতের জমি দখল করে নেবে।

ওইদিন সংসদে রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। যার চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। এও সবার জানা, এই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রয়েছে। চীনের থেকে নিয়মিত অনুদান পায় এই সংগঠনটি। ভারত-চীন সম্পর্কের এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গগুলি যাতে না ওঠে, সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই চীনের আক্রমণে ভারতের ক্ষয়ক্ষতির গল্প ফাঁদছে কিনা কংগ্রেসের-কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিরোধীরা সেই প্রশ্ন কিন্তু সঙ্গতভাবেই উঠছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর যথার্থই বলেছেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে এদেশের সেনার সত্যিই কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তেরো হাজার ফুট উঁচুতে যে জওয়ানরা প্রবল শীত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অসুবিধা উপেক্ষা করে দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে, তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপমানের অধিকার কারোর নেই। আমরা অতীতেও দেখেছি, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে সেনার বালাকোটের সন্ত্রাসঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার ভিডিয়ো দেখার পরও আদৌ ভারতীয় সেনা আঘাত হানতে পেরেছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে সেনাকে বিঁধেছিল বিরোধীরা। তারাই একদিন তাদের কায়েমী-স্বার্থে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও আমাদের প্রাত্যহিক রাজনীতি থেকে দেশপ্রেমকে বিযুক্ত রেখেছিল। এখনো তারা তাদের কায়েমী-স্বার্থকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশপ্রেম বস্তুটি কখনো রাজনীতির বিষয়বস্তু হতে পারে না। ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই দুর্ভাগ্যের যে, জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা দেশপ্রেমের মতো বিষয়গুলি আজ রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র রাজনীতির অনুসন্ধান না করে যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা উচিত, যাতে আগামীদিনে আমাদের রাজনৈতিক চরিত্র পথভ্রষ্ট না হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় নিরাপত্তা তাতেই সুনিশ্চিত হবে।

ভারতীয় রাজনীতিতে এখনো চীনপন্থীরা আছে, যারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে আমেরিকা কত নির্মম বোঝাতে চীনকে হিরো বানাতে চাইবে, ঠিক যেমনটা ভারত আক্রমণকারী চীনকে আক্রান্ত বানিয়েছিল ১৯৬২-তে। তাই দেশপ্রেম ও জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষা ও ইতিহাসটাও জানা দরকার।

তবে কূটনৈতিকভাবেও ভারত চীনের মোকাবিলায় যথেষ্ট সফল। তাইওয়ান নিয়ে চীনের আগ্রাসী মনোভাব ও আমেরিকার সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধ দুনিয়ার সামনে চীনের মুখোশ খুলে দিয়েছে। বিশ্বের মানুষ বুঝেছেন, শুধুমাত্র সুপার পাওয়ার হওয়ার লক্ষ্যে চীন দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, বিশ্বের স্থিতিশীলতাও নষ্ট করছে। চীনের এই আগ্রাসী মনোভাবে সারা পৃথিবী বিরক্ত। শুধু এটাই ভয়, ভারতীয় রাজনীতিতে এখনো চীনপন্থীরা আছে, যারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে আমেরিকা কত নির্মম বোঝাতে চীনকে হিরো বানাতে চাইবে, ঠিক যেমনটা ভারত আক্রমণকারী চীনকে আক্রান্ত বানিয়েছিল ১৯৬২-তে। তাই দেশপ্রেম ও জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষা ও ইতিহাসটাও জানা দরকার। □

আগামীদিনে আর্থিক উন্নয়নে ভারতবর্ষ বিশ্বকে পথ দেখাবে

আনন্দ মোহন দাস

সাধারণভাবে দেখা যায় ভারতবর্ষে বেশ কিছু বামপন্থী অর্থনীতিবিদ আছেন যারা রাজ্যসভার সদস্যপদের আশায় বা মতাদর্শের গোঁড়ামিতে আবদ্ধ থাকায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সব সিদ্ধান্তেরই সমালোচনা করেন। সেজন্য তারা নিরপেক্ষভাবে বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। এই দিগ্‌গজ অর্থনীতিবিদরাই করোনাকালে নোট ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে টাকা বিলি করতে বা সরকারি ভাবে অত্যাবশ্যক পণ্য জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্যে ওকালতি করেছিলেন। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইউরোপীয় দেশগুলি এবং চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ ধ্বংস বা মন্দার মুখে। আমরা জানি সারা বিশ্ব এখন আর্থিক মন্দার সম্মুখীন। বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আরও করুণ অবস্থা। সেক্ষেত্রে ভারতই একমাত্র দেশ যে তুলনামূলক ভাবে বিশ্বে আর্থিক ভাবে মজবুত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী সার্ভের পর বিল গেটস ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে মোদী সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য দেশগুলি মিলিত হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দীর্ঘকালীন উন্নয়নের লক্ষ্যে শূন্য দারিদ্র্য, ক্ষুধা নিবারণ, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বচ্ছতা ও দূষণমুক্ত জলবায়ু, আর্থিক উন্নয়ন, শিল্প, উদ্ভাবনী শক্তি ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন-সহ ১৭টি বিষয়ে সদস্য দেশগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ভারত-সহ সমস্ত সদস্য দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ওই ১৭টি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু সাতটি বছর অতিক্রান্ত, বিশ্বের অনেক দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ব আর্থিক মন্দা-সহ বিভিন্ন কারণে জি-২০ ভুক্ত বেশিরভাগ দেশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অনেক পিছিয়ে আছে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল হবে, আর্থিক উন্নয়ন হবে, বিশুদ্ধ জল ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং বেকারত্ব দূর হবে।

সম্প্রতি এই দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন দেশের বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে গত সেপ্টেম্বর মাসে বিল গেটস ফাউন্ডেশনের এক রিপোর্টে জানা গেছে যে উন্নয়নের প্রগতির হার খুবই কম এবং দেশগুলি লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতির পথ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এ বিষয়ে তুলনামূলকভাবে একমাত্র ব্যতিক্রম যে ভারত তা রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে। এই সংস্থার চেয়ারম্যান বিল গেটস ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব ও আর্থিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, ভারতই জি-২০ ভুক্ত দেশগুলিকে এ বিষয়ে পথ দেখাতে পারে। তিনি বলেছেন নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ দেশগুলির আসন্ন বৈঠকে মূল আলোচনায় স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার থাকবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। বৈঠকে ভারত তার বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সদস্য দেশগুলির সামনে রাখার সুযোগ পাবে এবং এবিষয়ে সদস্য দেশগুলি ভারতের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারবে বলে বিল গেটস আশা প্রকাশ করেছেন। রিপোর্টে ভারতের উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) কোভিডের সময় ভ্যাকসিন আবিষ্কার ও দ্রুত উৎপাদনে বিশ্বের কাছে ভারতের অবদান প্রমাণিত।

(২) ভারতের আবিষ্কৃত ৪০ শতাংশ ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এ ব্যাপার ভারত অল্প সময়ে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে বিশ্বকে কোভিড মহামারীর বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সহায়তা করেছে।

(৩) ২০২১ সালের প্রথমদিকে কোভিড মহামারীর সময় ভ্যাকসিন সরবরাহ কম থাকলেও ভারতে ২০০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজ উৎপাদন হয়েছে যা দেশের মধ্যে বিতরণ কর হয়েছে এবং ২৫ কোটির বেশি ভ্যাকসিন ডোজ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে ভারত বিশ্বের কাছে উদাহরণ স্থাপন করেছে।

(৪) বর্তমানে পশুভ্যাকসিন উৎপাদন করার জন্যও প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

(৫) ভারতে আর একটি বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়েছে তা হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি

বিদ্যা। রিপোর্টে আরও প্রকাশ, ডিজিটাল বিষয়ে ভারত সরকার যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তা এক কথায় অসাধারণ। স্বাস্থ্য বিষয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগে বিশ্বের কাছে এক উদাহরণ স্থাপিত করেছে বলে বিল গেটস জানিয়েছেন। যেমন, ভারত বিশ্বকে কোউইন অ্যাপের আবিষ্কারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবস্থা করেছে এবং অনেক দেশ এই অ্যাপের মাধ্যমে তাদের কোভিড মহামারী ও ভ্যাকসিন প্রদানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। এমনকী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতের আবিষ্কৃত কোউইন অ্যাপের ভূয়সী প্রশংসাও করেছে। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর এই অ্যাপের মাধ্যমে ২০০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজ প্রদান করেছে এবং ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের প্রশংসা পত্র দিয়েছে যা এক কথায় ঐতিহাসিক। এই ধরনের অ্যাপ না থাকলে কোটি কোটি ভ্যাকসিন অতি অল্প সময়ে সুপরিকল্পিতভাবে সারাদেশে সুষ্ঠু ভাবে দেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

(৬) সেই রকম আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটালাইজেশনের মিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রোগীর সম্পূর্ণ তথ্য ডিজিটালের মাধ্যমে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে রোগী তার রোগের তথ্য অতি সহজেই ডিজিটাল মাধ্যমে অনায়াসে দেখতে পাবেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিও এই রেকর্ড থেকে রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে উন্নত পরিষেবা প্রদান করতে সমর্থ হবে। এমনকী এই অ্যাপের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে টেলি কনসালটেন্সির ব্যবস্থাও করেছে। এই সমস্ত ডিজিটাল মাধ্যমগুলি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, অনলাইনে সকলের সঙ্গে যুক্ত এবং সহজেই ব্যবহারের উপযোগী হওয়ায় আজ প্রশংসিত।

(৭) ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন অন্তর্ভুক্তিকরণ বিশ্বের কাছে এক আদর্শস্বরূপ বলে রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে সকলকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ স্বাধীনতার পর এই প্রথম। তার ফলে মহিলা-সহ সকলেই সরকারি আর্থিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। স্বাধীনতার পর গরিব মানুষের জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খোলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মোদী সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে এটি একটি মহত্ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথ্যসূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৪৫ কোটি জনধন খাতা এখনও পর্যন্ত খোলা হয়েছে যার মধ্যে অর্ধেক হলো মহিলাদের অ্যাকাউন্ট। সুতরাং মহিলারা নিজের টাকা ব্যাংকে নিজেদের খাতায় রাখার সুবিধা অর্জন করেছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি মোদী সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ইউপিআই (unified payment system)-এর মাধ্যমে মহামারীর সময় ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে মাসিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোভিড মহামারীর সময় প্রায় ৩০ কোটির বেশি মানুষ ডিজিটালি আর্থিক অনুদান পেয়েছে।

(৯) করোনা মহামারীর সময় দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করতে মোদী সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো রাস্তার বিক্রেতাদের (street vendors) কার্যকরী মূলধন হিসেবে কোনোরকম জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান। এটি হলো প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা প্রকল্প।

এছাড়াও মুদ্রাযোজনার মাধ্যমে বেকার যুবকদের ব্যবসার জন্য বিনা জামানতে আর্থিক ঋণ প্রদান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। করোনাকালে লঘু উদ্যোগ (এমএসএমই) সংস্থাগুলিকে কম সুদে ঋণদান প্রকল্পও একটি সঠিক পদক্ষেপ বলেই আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

(১০) নরেন্দ্র মোদী ভালোভাবেই জানেন যে দেশ তখনই উন্নতি করতে পারবে, যখন আর্থিক ভবিষ্যতের ব্যাপারে মহিলাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা থাকবে। এ বিষয়ে বিশ্ব শিক্ষা নিতে পারে ভারত কীভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মধ্য দিয়ে মহিলাদের জীবিকা নির্বাহ ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়েছে। তথ্যসূত্রে জানা গেছে যে, আট কোটির ওপর মহিলা প্রায় ৭৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করেছে যেটি বিশ্বের বৃহত্তম কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে ফাউন্ডেশনের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে।

(১১) আরও প্রশংসিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযান মিশন পার্ট ২ প্রকল্প, যার মাধ্যমে স্বচ্ছতার বিষয়টি জন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই সামাজিক আন্দোলনে স্বচ্ছতা ও স্যানিটেসনের উন্নতির ফলে পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ও দূষণ মুক্ত হবে।

সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, কেন্দ্রের মোদী সরকার দেশের বুনিয়াদি সমস্যার সমাধানে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি সফলভাবে কার্যকর করায় যে উদাহরণ সারা বিশ্বে স্থাপন করেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। □

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

ওড়িশা পারে অথচ আমরা পারি না

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক তাঁহার রাজ্যের ৫৭ হাজার অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ী করার কথা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এরপর ওড়িশা সরকারের অস্থায়ী বলে কোনও কর্মী থাকল না। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন এবার থেকে ওড়িশায় শুধু স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হবে।

ওড়িশায় আঞ্চলিক দল বিজেডি ক্ষমতায় রয়েছে প্রায় পনেরো বছর হতে চলল। রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। তবুও সেখানে নির্বাচনে বিজেডি জেতার পর বিরোধী দল বিজেপির নেতা-বিধায়ক, কর্মী, সমর্থকদের হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে দেয় না বা বিজেপির হিন্দু সমর্থকদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং গৃহছাড়া, গ্রামছাড়া, রাজ্যছাড়াও করে না। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ভোটে জেতার পর বিজেপিকে শায়েস্তা করার জন্য কোনোদিন বলেননি— 'মাদ্রাসার ছাত্রদের লাগিয়ে দাও, ওরা খুব সাহসী।'

বিজেডি সরকারের প্রথম দিকে কেন্দ্রে যেমন কংগ্রেস সরকার ছিল তেমনি গত আট বছর ধরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার রয়েছে। তবুও এই সরকার প্রথম থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে দেশের মঙ্গল হবে, এরকম ইস্যুতে কেন্দ্রের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে কেন্দ্রের কাছে ওড়িশা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বদা সাহায্য পেয়ে থাকে।

নবীন পট্টনায়ক প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন চুরি-ডাকাতি, খুন, নারীদের ওপর অত্যাচার, জালিয়াতি এসবের অপরাধীদের তৎক্ষণাৎ গারদে ভরা হয়। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে যদি শাসকদলের চাপ থাকে, তাহলে যেন তাঁকে জানানো হয়। অর্থাৎ অপরাধ করলে শাসকদলের হলেও রেহাই নেই। পুলিশ কোনোরকম রাজনৈতিক দলদাস হবে না। তার ফলে ওড়িশা দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। তার ফলে ওড়িশা ক্রমশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। তাই তাঁর মুখে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ নেই। অভিযোগ নেই কেন্দ্র অমুক অমুক খাতের টাকা ইচ্ছে করে আটকে রেখেছে ইত্যাদি। অর্থাৎ কেন্দ্রে যে সরকারই থাকুক রাজ্যকে কীভাবে এগিয়ে

নিয়ে যেতে হয়, তা সঠিক জানেন তিনি।

এছাড়া যে সমস্ত কাজ নবীন পট্টনায়ক করেন না সেগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক। যেমন— পুলিশ যদি তাঁর দলের কাউকে গ্রেপ্তার করে তাহলে তিনি থানায় গিয়ে অপরাধীদের ছাড়িয়ে আনেন না। তাঁকে নিয়ে কার্টুনিস্টরা কার্টুন আঁকলে কার্টুনিস্টকে জেলে ভরেন না। নিজের দলের কোনো বিধায়ক, সাংসদ বা আইএসএস অফিসারকে সিবিআই বা ইডি ডাকলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ধরনায় বসেন না (যদিও ওড়িশায় ইডি এবং সিবিআইকে যেতে হয়নি)। নবীন পট্টনায়ক তাঁর রাজ্যে বিধানসভা বা লোকসভা ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইতরজনোচিত ভাষায় গালি দেননি বা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি সে রাজ্যে গেলে তাঁকেও নাড্ডা, ফাড্ডা, গাড্ডা, ভাড্ডা বলে গালি দেননি বা নাড্ডার কনভয়ে হামলা করার জন্য নিজের দলের কাউকে অনুপ্রাণিত করেননি। ওড়িশায় তিনি কোনোদিন রাস্তায় উন্নয়নকে দাঁড় করিয়ে রাখেননি, উন্নয়ন যা করেছেন তা সে রাজ্যের জনগণের জন্য করেছেন। বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপি দলের কোনো কর্মসূচিতে তাঁর অনুগামীরা অনুপ্রাণিত হয়ে বিজেপির কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি করেনি। এমনকী সে রাজ্যে বিজেপির কোনো কর্মকর্তার বাড়িতে বোমা, গুলি মারা তো দূরের কথা একটা ঢিলও ছোঁড়েনি।

নবীন পট্টনায়ক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঋণ করে স্ফুর্তি করেন না বা মেলা-খেলা নিয়ে মশগুল থেকে তাঁর রাজ্যকে ভিখারি বানানোর চেষ্টা করেননি। তিনি ধর্মীয় উৎসবে রাজ্যের ক্লাবগুলোকে ষাট হাজার করে টাকা দেন না। তাঁর রাজ্যে মন্ত্রীসভার কোনো সদস্য বা দলের বিভিন্ন কেউকেটারা কোনোদিন চুরির দায়ে জেলে যাননি বা আদালতের নির্দেশে ইডি-সিবিআইকে তার দলের নেতাদের বাড়িতে তল্লাশি করার জন্য যেতে হয়নি। ওড়িশার কোনো সাংবাদিক বা সংবাদসংস্থা কোনোদিন বিজেডি নেতা-মন্ত্রীদের হাত পেতে ঘুষের টাকা নেওয়ার ছবি দেখাতে পারেনি।

নবীন পট্টনায়ক কোনোদিন তাঁর রাজ্যকে সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে তোলেননি বা কোনো আন্তর্জাতিক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাকে রাজ্যসভার সদস্য করে সংসদে পাঠাননি। নবীনবাবুর মন্ত্রীসভার কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বুক ফুলিয়ে আজ পর্যন্ত ভুবনেশ্বর, কটক বা পুরী কোনো শহরকেই মিনি পাকিস্তান আখ্যা দেওয়ার সাহস পায়নি।

ওড়িশায় চাকরি প্রার্থীদের চাকরি পরীক্ষায় পাশ করেও ন্যায্য পাওনা চাকরির জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরনা বা অবরোধে বসতে দেখা যায়নি বা সেই ধরনা তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গভীর রাতে পুলিশ দিয়ে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে অনশনকারীদের টেনে-হিঁচড়ে, পিটিয়ে থানায় তুলে নিয়ে যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর পরের ধাপের কোনো নেতা বা সাংসদ পুলিশকে দোষারোপ করে বলেননি যে— 'আমি ওই সময় থাকলে কপালে গুলি করতাম।' নবীনবাবুর রাজ্যে কোনোদিন পুলিশকে আলমারির ফাঁকে, টেবিলের নীচে লুকোতে বা ফাইল দিয়ে মাথা বাঁচাতে দেখা যায়নি এবং পুলিশকে উড়ন্ত লুঙ্গির ছুটন্ত লাথি খেতেও দেখা যায়নি। নবীনবাবুর দলের কোনো নেতা কোনোদিন বলেননি যে— 'পুলিশকে বোমা মারো।' বরং সেরাজ্যে পুলিশই সকলকে টাইট দিয়ে রেখেছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র নবীনবাবুর মতো একজন সৎ, নির্ভেজাল এবং প্রকৃত উন্নয়নকামী রাজনীতিকের জন্য। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনি কোনোদিন চাননি ওড়িশা রাজ্য ইসলামি সন্ত্রাসীদের দ্বারা দ্বিতীয় বাংলাদেশ বা পাকিস্তান হয়ে উঠুক।

আরও দেখে নেওয়া যাক নবীনবাবু নিজে কী কী কাজ বা আচরণ করেন না। ঈদে, ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়ে ঠিকমতো ফটো উঠছে কিনা তার জন্য পিট্ পিট্ করে ক্যামেরার দিকে তাকাননি। তিনি ইনাশাল্লা, মাশাল্লা প্রভৃতি আরও ইসলামি শব্দ জনসমাবেশে উচ্চারণ করেছেন কিনা তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে জানা নেই। নবীনবাবু বই লিখেন না, ছবি আঁকেন না, বা দু'কোটি টাকায় তাঁর ছবি বিক্রির কথা জানা যায় না। তিনি কোনোদিন বলেননি— 'আমি তিনটে আঁচড় কাটলেই সেই ছবি কোটি টাকায় বিক্রি হবে।' তিনি গান করেন না, ভুলভাল তথ্য ওড়িশাবাসীকে গেলান না। নবীনবাবু যেখানে সেখানে সমাবেশে বিশেষ করে জনজাতি মহিলা-পুরুষদের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচেন না। বিরোধী দলের সঙ্গে নেড়িকুত্তার মতো ঝগড়া করেন না। সাঁওতালি ভাষায় ডহর মানে সরণি বা রাস্তা— সেই ডহরকে তিনি ডহরবাবুতে পরিণত করেন না। হিন্দুধর্মের পৌরাণিক দেবতা বিষ্ণু একজন পুরুষ হলেও তাঁকে তিনি বিষ্ণুমাতা হিসেবে সম্বোধন করেননি। নবীনবাবু কোনোদিন তাঁর বক্তব্যে ১০০ শতাংশ মিথ্যে কথা বলেননি বরং ১০০ শতাংশ সত্যিকথা তিনি বলে থাকেন।

নবীনবাবুর এই সমস্ত গুণাবলীর কারণে ওড়িশা আজ দেশবাসীর চোখে এক রত্নগর্ভা হয়ে উঠেছে। তাই, ওড়িশাকে কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে কারণে— রাষ্ট্রপতি ওড়িশা থেকে, শিক্ষামন্ত্রী ওড়িশা থেকে, রেলমন্ত্রী ওড়িশা থেকে, যোগাযোগ মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, বৈদ্যুতিন মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, জলশক্তি মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, নব্য উদ্যোক্তা মন্ত্রী ওড়িশা থেকে, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর ওড়িশা থেকে, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল ওড়িশা থেকে, এনসিবি প্রধান ওড়িশা থেকে, আইএসডি প্রধান ওড়িশা থেকে, এনডিআরএফ প্রধান ওড়িশা থেকে, আইওসিএল ডিরেক্টর ওড়িশা থেকে, এমনকী ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান পদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি প্রমোদ মিশ্রও ওড়িশারই মানুষ।

দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৩ শতাংশ ওড়িয়া। অবিজেপি সরকার থাকায় কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ বলতে গেলে নেই। তারপরেও ওড়িশার এই উত্থান বিস্ময়কর।

আসলে সবার উপরে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের নীতি— 'নীরব থাকো এবং কাজ করে দেখাও।' তিনি কোনোদিন বাগাড়ম্বরে বিশ্বাসী নন। তাই প্রশ্ন জাগে— ওড়িশা পারে অথচ আমরা পারি না, কেন?

পরিবেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখনও সচেতন নয়

শেখর সেনগুপ্ত

ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) জানিয়েছে, বিশ্বে উষ্ণায়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় সামগ্রিকভাবে আমাদের গ্রহ এগিয়ে চলেছে এক বৃহৎ বিপর্যয়ের দিকে। আকাশের রং বদলে যাচ্ছে। সাগর ও মহাসাগরের রংও আগের মতো আর নেই। 'নেচার-কমিউনিকেশন্‌স' পত্রিকার একটি নিবন্ধ জানাল 'মানুষ যদি এখনও সবুজ ও নীলের' গুরুত্ব বুঝতে না পারে, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সে এক বিলুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আমেদাবাদের এক জনসেবায় আবেদন জানিয়েছেন ২০২১-এর ১৩ মে, 'সবুজের ঘনত্ব বাড়ান। দূষণ বাড়াবেন না। অন্যথায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অভিশাপ দেবে আমাদের। কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোই হবে না। আমাদের দেশের ধূসরতাকে কমাতে হবে। বাড়াতে হবে নীল ও সবুজের প্রাধান্য।'

যাঁরা সমুদ্র নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন স্তেফানি দাতকিউয়েইতজ। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, 'খেয়াল করুন। দেখতে পাবেন বিশ্বের সবকটি সাগর মহাসাগরের রং বদলে যাচ্ছে। সাগরবাসী অতি ক্ষুদ্র জীব 'ফাইটোপ্লাঙ্কটন'রা খুব দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আর কবে এর তাৎপর্য বুঝতে শিখবে?' বছর তিনেক আগে 'নাসা' জানিয়ে দিয়েছে, 'বিশ্বের তাপমাত্রা কিন্তু এক ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবী কিন্তু আর কখনও এতটা উষ্ণ হয়ে ওঠেনি। আপনারা সাবধান হন।' লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু দুটি এশিয়ান দেশ প্রকৃতি দূষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দীর্ঘ ও কার্যকর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সেই দুটি দেশ হলো ভারত ও চীন। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

ভারত সরকারের সতর্ক প্রহরার এটা অন্যতম কৃতিত্ব। আমাদেরও সচেতন হওয়া খুব দরকার। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল 'সায়েন্স অ্যাডভান্স'-এর গত বছরের একটি সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'যানবাহনের ধোঁয়া, জীবাশ্ম জ্বালানি এবং আরও কিছু উৎস থেকে যে বিষাক্ত কার্বন মৌল ও যৌগের কণা বেরিয়ে আসে, সেগুলিই মিশে যায় কুয়াশায় এবং সেই কুয়াশা ভয়ংকর বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এটা স্বস্তির সঙ্গে লক্ষণীয় যে ভারত হলো সেই দেশ,— যে বর্তমানে খনিজ তেলের বদলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পথ খুঁজে নিচ্ছে যানবাহনের গতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।'

সৌরশক্তি ব্যবহার দূষণহ্রাসের অন্যতম আয়ুধ। তাই সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে সরকারি সহায়তা এখন লক্ষ্য। দুঃখের বিষয়, আমাদের কলকাতায় প্রার্থিত সচেতনতা এখনও দুর্লভ। কলকাতা পুরসভায় দৈনিক সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ওই জঞ্জালদের মধ্যে পচনশীলই হলো প্রায় ৫১ শতাংশ। এই আবর্জনার প্রকৃত বিনাশ কতটা যে করতে পারবে পুরসভা, তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। ফাঁকিবাজি চলছে। কাউকে একা দোষী করাটা অনুচিত। পথের দুইধারে প্রচুর চারাগাছ রোপণের মনস্কতা কী আমরা দেখতে পাই এই পশ্চিমবঙ্গে? হতাশা বাড়ে। ১৯১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের ১৯০টি দেশ একত্রে বসে যে অঙ্গীকার করেছিল, ক'টা দেশ তা বাস্তবায়িত করতে পেরেছে? তবুও ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় হয়নি বলেই ভারতের সচেতনতা বিশ্বসভায় আদর্শরূপে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু সকল রাজ্য সমানভাবে দায়িত্বসচেতন নয়। এ দায়িত্ব তো মুখ্যত রাজ্য সরকারগুলির। আমি যে এলাকায় বিগত দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে রয়েছি, সেখানে প্রত্যক্ষ করছি অতীব ক্ষতিকারক আবহকে তোল্লা দেওয়া হচ্ছে মাত্র। প্রভূতসংখ্যক মানুষ এসে আস্তানা গেড়েছে প্রতিবেশী দেশের বর্ডার পার হয়ে। মন্দিরের শঙ্খধ্বনি প্রায় কানেই আসে না, পরিবর্তে শুনতে পাই নানান দিক থেকে ছুটে আসা আজান। তবে পারস্পরিক সখ্য এযাবৎ বিনষ্ট হয়নি। ভবিষ্যতে যে হবে না, এমন গ্যারান্টি আর কে দিচ্ছে? ভোটার তালিকা যত স্ফীত হয়, রাজনৈতিক দেউলেপনা ততই বাড়ে। ধীরে ধীরে অনেক ছোটো-বড়ো জলাশয়কে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মাটি ও বালি দিয়ে। পথে-প্রান্তরে বিস্তর আবর্জনা। পক্ষী ও প্রজাপতির সংখ্যা হু হু করে কমছে। ভাঙাচোরা পথঘাটে পেট্রোল পুড়িয়ে ছুটছে দু'চাকা, চার চাকা। সচেতনতার স্পর্শ ভারতের এই রাজ্যটিতে এত কম কেন? এই প্রশ্নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার দাবি কিন্তু পর্যাপ্ত গতিতে ছুটে আসছে। ▯

আধুনিক সমাজের অতিপ্রয়োজনীয় শর্ত

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

বামপন্থী বা তাদের উদারবাদী বন্ধুরা অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকতে পারে। কিন্তু দেশের পক্ষে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব নয়। সারা দেশে অভিন্ন আইন প্রণয়নের জন্য জনমত ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। ইতিহাসের গতিকে আর আটকে রাখা বা তাকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

ড. বিমল শঙ্কর নন্দ

এদেশের বাম-উদারবাদীরা গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে গোটা দেশের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে প্রায়ই বলে, তারাই নাকি প্রকৃত আধুনিকতার ধ্বজাধারী। বিশেষত কমিউনিস্টরা মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বের উদাহরণ টেনে ভারতীয় সমাজের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা এবং তাতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে হাজার হাজার পাতার থিসিস লিখে ফেলেছেন। এমনকী জাতীয়তাবোধ, হিন্দুত্ব প্রভৃতি ধারণাগুলিও আধুনিক উন্নত ভারত গড়ে তোলার জন্য বেশ বড়োসড়ো বাধা, তাও নানা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে আসছেন বহুদিন ধরে। কিন্তু কথায় বলে নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে তত্ত্বকথা মাথায় ওঠে। তখন সকলেই বড়ো বেশি বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কমিউনিস্ট ও উদারবাদীদের তত্ত্বের বদলে বাস্তবকে আঁকড়ে ধরার মরিয়া প্রচেষ্টা দেখা গেল সাম্প্রতিককালে। গত ৯ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় রাজস্থান থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ কিরোডিলাল মিনা একটি প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসেবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ২০২২ বিলটি পেশ করার পরই বিরোধীদের একটা বড়ো অংশের বিশেষত বাম-উদারবাদীদের সমবেত বাধাদান দেখে মনে হলো রাজনৈতিক স্বার্থে মতাদর্শকে দিব্যি জলাঞ্জলি দেওয়া যায়। কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, প্রভৃতি তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলি (এদের সঙ্গে ডিএমকে, টিএমসি-ও যোগ দিয়েছিল। প্রগতিশীলতার মাপকাঠিতে এরা ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়বস্তু) একেবারে সমস্বরে বলেছে এই বিল নাকি ভারতের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেবে। ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথাই বলে এসেছে। এই বিল নাকি সেই সংস্কৃতির বিরোধী। এটা ভারতের সামাজিক বন্ধনকেও একেবারে নষ্ট করে দেবে বলে তাদের অভিযোগ।

বৈচিত্র্যরক্ষার নামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিছু ধর্মীয় কিংবা সামাজিক প্রথা যা আধুনিতকার পথে বড়ো প্রতিবন্ধক হলেও চালিয়ে যেতে হবে, এই যুক্তি দিতে পারে কেবল সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি যারা প্রায়শই কুযিুক্তির বেড়াজালে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যুক্তিকে ব্যবহার করেন ভুল মত প্রতিষ্ঠা করতে। তাৎক্ষণিক তিনতালাক বাতিলের সময়ও এই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। সেবারেও এরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবারেও এরা ভুলে যাচ্ছেন যে ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে প্রগতিশীলতার পথ ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে। সেই আধুনিকতার পথে বাধাগুলিকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে জনগণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে। সমাজের সর্বত্র এ নিয়ে চর্চা চলছে । সাংসদ কিরোডিলাল মিনার প্রাইভেট মেম্বার বিলের মধ্যে এই চর্চা ও ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই

ভাবনাকে আর দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

সমাজ এগিয়ে চলে সামনের দিকে, প্রগতিশীলতার পথে। একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অভাব ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক বিকাশের সম্ভাবনাকে যে খর্ব করছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু মানুষের মনে যদি এই ভাবনাকে প্রোথিত করে রাখা হয় যে তাদের জীবনধারার কিছু অংশ তা সে যতই প্রগতিবিরুদ্ধ হোক সেগুলি চলে গেলে তাদের পৃথক পরিচিতি নষ্ট হয়ে যাবে তবে তা আধুনিকতার পথে এক বড়ো বাধা হয়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ দেওয়ানি বিধি নিয়ে দেশের মুসলমান সমাজের মানুষদের এটাই বুঝিয়ে এসেছে। অথচ অভিন্ন আইনের ধারণাটি আজকের নয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজের সকল মানুষের জন্য অভিন্ন বিধি প্রণয়ন শুরু হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে এ ভি ডাইসির আইনের অনুশাসন নীতিতে সবাইকে আইনের চোখে সমান বলে প্রতিপন্ন করা হয়। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত The Law and the Constitution গ্রন্থে ডাইসি এই নীতির প্রকাশ ঘটান। ব্রিটেনে যেহেতু কোনো লিখিত সংবিধান নেই, তাই আইনের অনুশাসনকে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। কিন্তু অভিন্ন আইন বিধি এর অনেক আগে ফ্রান্সে প্রবর্তিত হয়েছিল। এর উদাহরণ ১৮০৪ সালের ফরাসি কোড যা সেই সময়কার সবরকমের প্রথাগত বা বিধিবদ্ধ আইনকে নির্মূল করে একটি অভিন্ন বিধি গড়ে তুলেছিল। কোনো ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়ভিত্তিক আইনকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়নি। ধীরে ধীরে সমস্ত ইউরোপীয় দেশ এই পথের পথিক হতে থাকে।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক এদেশের জন্য আইন বিধিবদ্ধকরণের কাজ শুরু করেছিল এখানে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। এদেশে সতীদাহ প্রথার মতো সামাজিক কুপ্রথার অবসানের কাজও করেছিল রাজা রামমোহন রায়ের মতো প্রগতিশীল ভারতীয়ের চাপে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্রিটিশকে তাদের নীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নেয়, এদেশ শাসন করাই তাদের সবচেয়ে বড়ো অগ্রাধিকার। সমাজ সংস্কারের পথে খুব বেশি অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই। তাই ভারতের সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন না করার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় পরিচালনাকারী ব্যক্তিগত বিধিগুলিকে বদল না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক। ফলে অভিন্ন আইনবিধির যে দাবি শিক্ষিত সমাজ থেকে উঠে আসছিল তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিন্ন আইনবিধি বলতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথাই মূলত বলা হয়। কারণ ফৌজদারি আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য হয়। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে অপর সম্পদায় থেকে পৃথক করার চেষ্টা চলে ব্যক্তিগত আইনের মাধ্যমে।

স্বাধীনতার পর সংবিধান রচনার জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল সেখানেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবিতে ব্যাপক যুক্তির প্রদর্শন করা হয়েছিল। অবশ্য বিরুদ্ধ যুক্তিও দেখানো হয়েছিল মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা। স্বাধীনতার ঠিক পর মুহূর্তেই ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব এই বিষয় নিয়ে কোনো সমস্যা হোক তা চাননি। কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন থেকে চিরদিনের জন্য পিছিয়ে আসার কথাও তাঁদের ভাবনায় ছিল না। তাই সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতির অংশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে যুক্ত করা হয়। সংবিধানের ৪৪ তম ধারায় বলা হয় "সরকার সমগ্র ভারতের সকল নাগরিকের জন্য একই দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।" রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি হলো রাষ্ট্রের প্রতি সংবিধানপ্রদত্ত কিছু নির্দেশাবলী যা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে সরকার পালন করার চেষ্টা করবে। ড. বি আর আম্বেদকরের মতে, এই নীতিগুলি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে প্রকাশ করে। নির্দেশমূলক নীতি সমন্বিত সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রধান

প্রেরণা হলো জনকল্যাণের ধারণা (কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য, ১৯৭৩ মামলা)। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা এবং এগুলির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন। বিচারপতি পি বি গজেন্দ্র গাডকরের মতে, ‘‘The ultimate object of the Directive Principles is to be liberate the Indian masses in a positive sense; to free them from the passivity engendered by centuries of coercion by society and nature and by ignorence ।” যারা বৈচিত্র্য রক্ষার নামে কিছু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনকে টিকিয়ে রাখার কথা বলে সে আইন যতই পশ্চাৎপদতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হোক, তারা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দিতে চায়, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে। মুখে আধুনিকতার কথা বললেও এরাই সবচেয়ে বেশি পশ্চাদ্‌গামী। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্তকরণের প্রধান কারণ ছিল, এক সমাজ কল্যাণকারী আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এর জন্য মৌলিক অধিকারগুলির সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিগুলির সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস মামলার রায় দিতে গিয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন, ‘ মৌলিক অধিকারগুলিকে নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং এই সামঞ্জস্য সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।’ অর্থাৎ নির্দেশমূলক নীতিগুলি কেবল সংবিধানে সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। দেশ ও সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে নির্দেশমূলক নীতিগুলির রূপায়ণ জরুরি। ১৯৮৫ সালে শাহ বানো বনাম মহঃ আহম্মদ খান মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ অভিমত পোষণ করে যে সংবিধানের ৪৪ নং ধারায় সন্নিবিষ্ট নির্দেশমূলক নীতির রূপায়ণ আশু প্রয়োজন। আবার ১৯৯৫ সালে সরলা মুদগল মামলায় রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলেন যে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অবিলম্বে রূপায়ণ করার প্রযোজন আছে। একই অভিমত

কিছু রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। কমিউনিস্ট, উদারবাদী ও আঞ্চলিকতাবাদী দলগুলি প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করেছে।

পোষণ করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২০২১ সালের একটি রায়ে। হাইকোর্টের দৃঢ় অভিমত ছিল ‘The Uniform civil Code is a necessity And mandatorily required today ’। হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের আরও অনেক রায়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা বার বার এসেছে।

তারপরও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কেন চালু করা হয়নি এই দেশে? কারণ কিছু রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। কমিউনিস্ট, উদারবাদী ও আঞ্চলিকতাবাদী দলগুলি প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করেছে। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভণ্ডামি অনেক বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে। বামেরা মনে করে পরিবর্তন আনার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকলে এবং পূর্বশর্তগুলি উপস্থিত থাকলে মানুষের প্রচেষ্টায় পরিবর্তন আসতে পারে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ জারকে অপসারিত করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পর প্রশ্ন উঠেছিল যে মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রের পরই সমাজতন্ত্রের উল্লম্ফন ঘটেছে। এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কসবাদীরা বলেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিবাদের অপেক্ষায় বসে থাকার কারণ নেই। পরিবর্তনের পূর্বশর্ত উপস্থিত ছিল এবং মানুষের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে। এতে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির কোনো প্রশ্নই নেই। অথচ সেই মার্কসবাদীরাই ভারতে কিছু সম্প্রদায়ের পুরনো সামাজিক প্রথার বদল আনতে অনন্তকাল অপেক্ষা করার পক্ষপাতী। তাৎক্ষণিক তিনতালাকের বিলোপের বিরুদ্ধেও একই কথা বলা হয়েছিল। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন বিষয়েও একই যুক্তি দেখানো হচ্ছে। আসলে এর পেছনে একটি রাজনীতি আছে। কোনো সম্প্রদায়কে পিছিয়ে রাখলে, তাদের আধুনিক ধ্যানধারণা থেকে দূরে রাখতে পারলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা অনেক সহজ। তার জন্য যদি ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয় তাহলেও হবে।

বামপন্থী বা তাদের উদারবাদী বন্ধুরা অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকতে পারে। কিন্তু দেশের পক্ষে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব নয়। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এক শক্তিশালী আধুনিক ভারত গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ। সেজন্য মানুষ বারবার রায় দিয়ে এই সরকারকে ক্ষমতায় আনছে। সারা দেশে অভিন্ন আইন প্রণয়নের জন্য জনমত ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। ইতিহাসের গতিকে আর আটকে রাখা বা তাকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি

সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক দুর্নীতি যা মানুষকে হতাশ করেছে। মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দুর্নীতি কীসে নেই? লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর জীবন বিপর্যস্ত। তারা এককথায় দিশাহারা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি। একটা হাস্যকর পরিস্থিতি। শিক্ষক নিয়োগ হয়ে গিয়েও দুর্নীতির বিপাকে পড়ে শিক্ষকতা থেকে বরখাস্ত এবং কোর্টের নির্দেশে মাইনা ফেরত। একে হাস্যকর বলবো না তো কী! এই লজ্জাকর পরিস্থিতি কেউ দেখেছে আগে কখনও? সব কাজই দুর্নীতিতে ভরা। দুর্নীতি শব্দটা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে অবাক হবার কিছু নেই, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। সমস্ত দুর্নীতির বিচারের দায়িত্ব এখন আদালতের উপর। সিংগলবেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর মানুষ তাকিয়ে আছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? যা ক্ষতি হবার তা তো শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরই হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? কে তার জবাব দেবে?

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

বিশ্বে 'বিপন্ন গণতন্ত্র'কে রক্ষা করতে পারে বিচার ব্যবস্থা

বিশ্ব মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান 'গণতন্ত্র'। ইতিহাসে এক সময় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মানচিত্রে একনায়কতন্ত্রের রমরমা ছিল। সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভুদের হুংকারের তলায় চাপা পড়ে যেত। ধীরে ধীরে যত সভ্যতার আলোকের বৃত্তে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলল, তত নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করল মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আস্থা বাড়তে থাকল মানুষের। কিন্তু সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে স্টকহোমের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্টান্স (আইডিয়া) বিভিন্ন দেশে সমীক্ষা করে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে তা থেকে জানা যাচ্ছে, বহু গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্রমে একনায়কতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকছেন। ফলশ্রুতি হিসেবে গণতন্ত্রের অধঃপতন ঘটছে। আমাদের ভারতেও তার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিচার ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের রক্ষক। বিচারে জার্মান সেনাপতি অ্যাইকম্যান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্রমওয়েল অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং মৃত্যুর ২৮ বছর পর তার কঙ্কাল কবর থেকে উঠিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। গণতন্ত্রকে সুষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারে একমাত্র বিচার ব্যবস্থাই— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা।

কান্তারা দেখে শেখার চেষ্টা করুন

বাংলা চলচ্চিত্রের জগতের কর্ণধাররা কি কান্তারা দেখলেন? এই ছবির প্রযোজক নন্দনের ট্যাক্স ফ্রি হল পায়নি বলে কাঁদেননি কিন্তু। সাধারণ বাঙ্গালি কিন্তু নায়ক নায়িকার নাম জানেন না। পটভূমি কর্ণাটক, সংস্কৃতি মেলে না। তার পরেও কলকাতার মাল্টিপ্লেক্সে পাঁচ সপ্তাহ। সিনেমায় সেকুলারিজমের জয়গান নেই, লাভ জেহাদ নেই, আছে স্বাভাবিক সুন্দর এক গল্প ও অভিনয়।

এবার কিন্তু টালিগঞ্জের ভাবা উচিত কীভাবে ভালো কাহিনি নিয়ে কাজ করা যায়। মেধা না থাকলে তেলুগু টুকুন এবং বাংলা সিনেমার বাজার তৈরি করুন। লাভ জিহাদ বেচে বাজার খুঁজবেন না। ধর্মযুদ্ধ বা বিসমিল্লার মতো অবস্থা হবে কিন্তু। কান্তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাজার এখানে আছে। কিন্তু কলেজের যুবক ছেলেকে আর লুঙ্গি বেচলে হবে না। দক্ষিণীরা জিন্স বেচে বাজার ধরে নেবে।

দক্ষিণী প্রযোজকরা একসময় শুরু করেছেন জাপানি বা কোরিয়ান ছবি টুকে। বাজার তৈরি করেছে এবং আজ ইন্ডাস্ট্রিতে লোকজনকে পয়সা দিচ্ছে। উচ্চমেধার লেখক, পরিচালকরা সেখানে পয়সা পাচ্ছেন, ভালো কাজ করছেন এবং খানেদের বলিউডে তালা লাগাচ্ছেন। প্রযোজকরা তাঁদের সময়মতো উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিচ্ছেন, যা আপনারা অনেকেই দেন না। অন্যদিকে, আপনাদের কাজ মানে সেই বস্তাপচা গল্প এবং লোকজনকে ঠকানো। একদিকে, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের পেমেন্ট না করা এবং তারপর ফ্লপ হয়ে গেলে পুরস্কারের জন্য দৌড়াদৌড়ি।

কলকাতার মাছের বাজার অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা ধরে রেখেছে, ডিমের বাজার কর্ণাটক, সেরমিক/ওষুধ গুজরাট। কোচিং ব্যবসা রাজস্থান- তেলেঙ্গানার। এবার ফাইভ-জি প্রযুক্তি আসছে। এবার কিন্তু এআইআইএমএস/ভেলোর/নারায়ণ/শঙ্কর নেত্রালয় তালা ঝোলাবে বাইপাসের পাশের কসাইখানা থুড়ি বেসরকারি হাসপাতালগুলোর। কান্তারা আপনাদের নোটিশ দিয়ে গেল। হয় ভালো কাজ করুন, নয় 'দিদিকে বলুন' একটা টিকিট দিতে। পেনশনের ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে। নইলে, তালা কিন্তু টালিগঞ্জেও ঝুলতে চলেছে।

—সুদীপ্ত গুহ,
কলকাতা-৯৪।

পূর্ণিয়া নামের উৎস

বিহার রাজ্যের একটি পুরনো জনপদ পূর্ণিয়া। বহু বাঙ্গালির বাসভূমি এই জনপদে। মুঘল যুগে সেনানিবাস ছিল যা উত্তর-পূর্ব ভরতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। এখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী মাতা পুরাণদেবীর (দুর্গা) মন্দির। এখানে বছরে দুবার নবরাত্রি পালন করা হয়। বহু ভক্তের ভিড় হয়। মনে করা হয় পুরাণদেবীর নাম অনুসারে জনপদের

নাম হয় পূর্ণিয়া। আবার অনেকে মনে করেন পূর্ণ-অরণ্য থেকে পূর্ণিয়া হয়েছে। এখানে পূর্ণ-অরণ্য মানে জঙ্গলাকীর্ণ। উল্লেখ্য, 'পূর্ণ-অরণ্য' শব্দটি সংক্ষেপে 'পূর্ণ' হয়ে যায়। 'পূর্ণ' শব্দটি স্থানীয় উচ্চারণে পুর্ণিয়া হওয়াই সঙ্গত। পূর্ণ (পূরণ-পূরাণ-পুরাণ) নামের অনুকরণে দেবীর নাম হয় পুরাণদেবী। এই দেবী খুবই লোকপ্রিয়। সব সময় ভক্তের আনাগোনা চলছে। উল্লেখ্য, দেবী পুরাণ ও স্থান পূর্ণিয়া নামের মূলে রয়েছে পূর্ণ-অরণ্য অর্থাৎ পূর্ণ শব্দটি।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

বাঙ্গালির ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি কি অবশ্যম্ভাবী

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের অনুকরণপ্রিয়তা যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আশঙ্কিত হতে হচ্ছে যে বাংলা ভাষা, বাঙ্গালির খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। যে কোনও বাঙ্গালি বিশেষ করে তথাকথিত সেলিব্রেটিরা অর্থাৎ যশস্বী ব্যক্তিরা বাংলায় কথা বলতে বলতে ইংরেজি শব্দ দু'চারটি ব্যবহার না করলে ঠিক তৃপ্ত হন না। উচ্চবিত্তরা তো বটেই মধ্যবিত্তরাও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নন। বাড়ির ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করাতে না পারলে কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগেন। কিছু ইংরেজি শব্দ তো এখন বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

অনেককে বলতে শুনেছি 'আমার ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে তো তাই বাংলাটা ওর তেমন আসে না। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাঙ্গালি ছেলে বা মেয়ে বাংলাটা জানে না, এটা কতই না গর্বের বিষয়! বাঙ্গালির খাদ্য তালিকা থেকে এখন চচ্চড়ি, ছেঁচকি, ডালনা, দম, পাতুরি, ভাপা, ঘন্ট, ভাতে প্রভৃতি শব্দগুলির অবলুপ্তি ঘটেছে। তাদের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে বিরিয়ানি, কাবাব, ফিঙ্গার চিপস্, স্যুপ, রোস্ট, নুডুলস, পিৎজা, মোমো, আরও অনেক কিছু; সেসব আমার জানাও নেই। টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে সংগীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। শ্রোতারাও বাঙ্গালি। গায়ক, গয়িকারা প্রায় সবাই বাঙ্গালি। তাহলেও পরিবেশিত হচ্ছে হিন্দি সিনেমার হিট গান। মাঝে মাঝে দুই একটা বাউল বা বাংলা লোকসংগীত। সব কিছু বিবেচনা করে মনে হওয়া অস্বাভাবিক যে বাংলা ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

বিশ্বকাপে ভারত

এই চিঠি যখন লিখতে বসেছি তখন কাতারে রমরম করে চলছে বিশ্বকাপ ফুটবল। প্রথম চারে পৌঁছে গেছে ফ্রান্স, মরক্কো, আর্জেন্টিনা ও ক্রোয়েশিয়া। আর এখান থেকেই উঠে আসছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভারত কবে বিশ্বকাপ খেলবে? একশো চল্লিশ কোটি জনসংখ্যার দেশে এগারোজন বিশ্বমানের ফুটবলার নেই একথা মেনে নেওয়া কষ্টকর। ভারত ক্রিকেটে তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হকিতে একাধিকবার অলিম্পিকে সোনা পেয়েছে। এছাড়া, অলিম্পিকে রাইফেল শুটিং ও জ্যাভলিন থ্রোয়িঙে স্বর্ণপদক পেয়েছে ভারত। সাফল্য অধরা শুধু ফুটবলেই। বাষট্টির এশিয়াডে স্বর্ণপদক জয় ছাড়া আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের বলার মতো সাফল্য নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাড়ে সাত দশক অতিক্রান্ত হলেও ফুটবলে ভারত এতটা পিছিয়ে কেন? এর প্রধান কারণ যথার্থ পরিকাঠামোর অভাব। পশ্চিমবঙ্গকে সামনে রেখেই বলা যেতে পারে যেতে পারে যে সত্তর আশির দশকে বহু ছোটো ছোটো ফুটবল ক্লাব ছিল যারা গ্রামগঞ্জ থেকে ফুটবল প্রতিভা খুঁজে আনার কাজটা করত। যেমন ভ্রাতৃসঙ্ঘ, বালি প্রতিভা, শালকিয়া ফ্রেন্ডস ইত্যাদি। এইসব ক্লাব এখন যবনিকার অন্তরালে। ফুটবল মাঠও প্রমোটারদের দখলে চলে গেছে। ফলে নবীন প্রতিভা খুঁজে আনার কাজ বন্ধ। এই অবস্থায় ভারতের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন মনে হয় স্বপ্নই থেকে যাবে।

—**দিলীপ রায়,**
কাঁথি, পূর্বমেদিনীপুর।

এথিক্স বনাম পলিটিক্স

আজ একথা গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের লজ্জা। তিনি মিথ্যা কথা বলার জাদুকর। জনগণ তাঁর কথায় বিশ্বাস করে সিপিএমের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আজ তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। তারা আজ সিপিএমের মতোই এই বিশ্বাসঘাতিনীর হাত থেকে বাঁচতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি কুকথা, কুশাসন, কুনাট্যের জননী। পা ভাঙার অভিনয় করে, কখনো-বা মঞ্চে মঞ্চে বল নিয়ে 'খেলা হবে' বলে স্লোগান দিয়ে জনগণকে ভুল পথে চালিত করছেন। উন্নয়ন নয়, শুধু ব্যক্তিআক্রমণে তিনি সদা ব্যস্ত। জঙ্গিদের মতো তাঁর ভাষা সন্ত্রাসে আমাদের রাজ্য জর্জরিত। তিনি শোষণ, অত্যাচার, অপশাসনের একচ্ছত্র নেত্রী। একদিকে চাকরি বিক্রির কোটি কোটি টাকার পাহাড় দেখছি, অন্যদিকে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা মাসের পর মাস চাকরির জন্যে ধরনা দিচ্ছেন। সরকারের কোনো হেলদোল নেই।

একদিকে দুর্গাপুজোর শোভাযাত্রার উন্মাদনা, অন্যদিকে মাল নদীর হড়পা বানে দর্শনার্থীদের অকালমৃত্যুতেও আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটছে না। তিনি রাজা নিরোর মতো সমুদ্রবক্ষে বেহালা বাজাচ্ছেন যখন রোম নগরী পুড়ে ছারখার হচ্ছে। হয়তো তিনি ক্ষান্ত হতেন, শারদীয়া উৎসব যদি পুজো হতো। এখন পুজো নয়, শুধু কার্নিভাল। রাজ্যে শিক্ষা, চাকরি, শিল্প নেই। চারদিকে শুধু টাকা চুরি, টাকা লুটপাটের চিত্র। তাই জনগণ এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতির লড়াই করছেন। নেতাদের পলিটিক্সের বিরুদ্ধে জনগণের এথিক্সের লড়াই চলছে।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ভারতের অন্তিম পঙ্ঘল

নিবেদিতা রক্ষিত

প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে সোনা জিতে নজির গড়লেন ভারতের অন্তিম পঙ্ঘল। শুক্রবার বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় কাজাখাস্তানের আটলিন সাগায়েডা'কে ৫৩ কেজি বিভাগে ৮-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টের ৩৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ভারতীয় শীর্ষে শেষ করলেন। পরিবারের চার ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো অন্তিম ম্যাচের শুরু থেকে প্রতিপক্ষের উপর দাপট দেখিয়েছেন।

ফাইনালে প্রতিটি লড়াই জিতেছিল বড়ো ব্যবধানে। কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানি প্রতিপক্ষ ছিলেন আয়াকা কিমুরা। সেমিফাইনালে ইউক্রেনের নাটালিয়া কিলভুসকা'কে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন হরিয়ানার হিসারের ভাগানা গ্রামের বাসিন্দা ১৭ বছরের এই কিশোরী।

বড়দি সরিতাকে দেখে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ জন্মায় অন্তিমের। সরিতা জাতীয় দলের কবাডি খেলোয়াড়। ভারতের জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন।

জন্মের পর পরিবারের লোকেরা তাঁর নাম অন্তিম রেখেছিলেন এই আশায় যে আর যেন মেয়ে না হয়। পরিবারের প্রথম তিন সন্তানই মেয়ে। খুব আশা করেছিলেন যে চতুর্থ সন্তান ছেলে হবে। কিন্তু আবারও জন্ম হয় কন্যাসন্তানের। ফলে তার জন্মের পর আনন্দের পরিবর্তে বিষণ্ণতার আবহ তৈরি হয় পরিবারে। সেই চতুর্থ সন্তানই যে একদিন পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে তা কল্পনাও করতে পারেননি কেউ।

নাম অন্তিম পঙ্ঘল। বয়স ১৮। হরিয়ানার মহিলা কুস্তিগির। দেশের প্রথম মহিলা কুস্তিগির হিসেবে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্ব রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জিতেছেন। বাবা রামনিবাস পঙ্ঘল, মা কৃষ্ণা কুমারী।

অন্তিমের পদকজয়ের পিছনে একটি নেপথ্য কাহিনি রয়েছে। যে বগানা গ্রামে জন্ম অন্তিমের সেই গ্রামে একটি প্রথা রয়েছে। যে পরিবারে কন্যাসন্তান বেশি সেই পরিবারের শেষ সন্তানের নাম রাখা হয় কাফি বা অন্তিম।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অখুশি হলেও মা-বাবা কিন্তু তাঁকে বরাবরই আগলে রাখতেন। তাঁর সমস্ত ইচ্ছাপূরণে সমর্থন করেছেন। এক সংবাদমাধ্যমে রামনিবাস পঙ্ঘল জানান, 'বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার আগে মেয়ে বলেছিল বাড়িতে ফিরবে সোনার পদক নিয়েই। কথা রেখেছে।'

অন্তিমের তিন দিদি সরিতা, মীনু ও নিশাও অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বাবা চাষের কাজ করেন। বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য মায়ের সঙ্গে জমিতে যেতেন তিনিও। যাতায়াতের পথে গ্রামের একটি আখড়ায় কুস্তি দেখতেন অন্তিম।

ক্রমে তাঁর কুস্তির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। পরে বাবা রামনিবাস অন্তিমকে একটি আখড়ায় ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি একটি ঘর ভাড়া করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ফলস্বরূপ, ২০১৫ সাল থেকে কোচ রোশনী দেবীর কাছে প্রথম কুস্তি শেখা শুরু হয়। ২০১৮ সালে জাতীয় স্তরে অনূর্ধ্ব ১৫ প্রতিযোগিতায় জেতেন অন্তিম। তারপর জাপানে অনূর্ধ্ব ১৫ এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। ২০২০-তে ওয়ার্ল্ড ক্যাডেট রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। তিনি ২০২২-এ অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্ব রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা নিশ্চিত করেন।

অন্তিম জানিয়েছেন, 'জয় আমাকে নতুন আশা দিয়েছে এবং এখন আমি আগামী মাসের সিনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' □

শিশুর ওজন বেড়ে গেলে শরীরে আসে অনেক সমস্যা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শিশুকে মোটা নয়, সঠিক ওজন নিয়ে বেড়ে ওঠার সহায়তা করা উচিত। প্রয়োজনে শিশুকে বিশেষজ্ঞ হোমিও-চিকিৎসককে দেখাতে হবে। অনেকের বিশ্বাস, শিশু নাদুসনুদুস বা স্থূল হলে ভালো। অনেকেই মা-বাবাকে কথা শুনিয়ে থাকেন যে, বাচ্চা কেন দেখতে রোগা- পাতলা হবে। তাই বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভালো করতে তাকে বিভিন্ন ধরনের হাইক্যালোরি খাবার খেতে দেওয়া হয়।

এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে খেতে আর বসে বসে মোবাইল ফোনে গেমস খেলতে খেলতে শিশুর ওজন বেড়ে যায়। তারপর দেখা যায়, তার ঘাড়ের চারদিকে কালো হয়ে যাচ্ছে। পেটও মোটা হয়ে যায়। দেখতেও খারাপ লাগে। শরীরে ইনসুলিন হরমোনের কার্যক্ষমতা কমে যায়। ফলে পরে ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

সেই কারণে শিশুকে অতিরিক্ত না খাইয়ে খাবার তৈরির পদ্ধতি পরিবর্তন করা উচিত। যেমন মেয়োনিজ কম দিয়ে ব্রাউন ব্রেড ব্যবহার করে স্যান্ডউইচ তৈরি করা। যেমন বিভিন্ন শাক দিয়ে স্যালাড তৈরি করে দেওয়া। রঙিন সবজির রেসিপি শিশুমনে ভালো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ফ্রোজেন খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে টাটকা শাকসবজি দিয়ে খাবার তৈরি করলে ফ্যাট কমবে আবার সঙ্গে শিশু পাবে তার পুষ্টিগুণও। উল্লেখ্য, ওজন কমানোর দরকার থাকলে শিশুরা দিনে ১৫০০ থেকে ১৬০০ ক্যালরি খেতে পারে। তবে তা ঠিক করা উচিত একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে।

এছাড়া স্থূল পুরুষশিশুর কখনও কখনও স্তন বড়ো হয়ে যায়, যা তার শরীরে

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে। ফলে বিলম্বিত হতে পারে বয়ঃসন্ধি। অনেকের কাছে শিশুর পুরুষাঙ্গ ছোটো মনে হওয়ায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তখন শিশুকে ওজন কমানোর কথা বলেন চিকিৎসক। স্থূল হওয়ার কারণে শিশুর শরীরে আরও অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অনেকে খুব অল্প বয়সেই উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগে। কারও কারও শরীরে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব বেশি বেড়ে গিয়ে ধীরে ধীর যকৃত, পিত্ত কিংবা হৃদযন্ত্রের জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

অতিরিক্ত স্থূলতার কারণে ঘুমের সময় অনেকের শরীরে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। অল্প বয়সে হতে পারে হাঁপানি। পায়ের হাড়ে বা সন্ধির সমস্যা থেকে হাঁটতে কষ্ট হতে পারে। অনেকে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। এমনকী মানসিক সমস্যায়ও ভুগতে পারে। স্থূলতার কারণে অনেক মেয়ের আগে পিরিয়ড হওয়া, দেরিতে বা অনিয়মিত মাসিকের সমস্যা, কারও মুখমণ্ডলে অবাঞ্ছিত লোম, চুল পড়ে যাওয়া-সহ শরীরে বিভিন্ন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শিশুকালে যাদের ওজন বেশি থাকে, বড়ো হলেও তাঁরা স্থূলতার সমস্যায় ভোগেন। এমনকী কেউ কেউ অকালে প্রাণ হারাতে পারেন। তাই অল্প বয়স থেকেই নিয়মিত শিশুর ওজন পরীক্ষা করা এবং ওজন বেশি হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে তার কারণ অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। যত আগে এর চিকিৎসা করা যায়, আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা তত বেশি।

পাশাপাশি ছোটোবেলা থেকে স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করে এবং পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রমের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

তাই শিশুকে মোটা নয়, সঠিক ওজন নিয়ে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা উচিত। প্রয়োজনে শিশুকে কোনো হোমিও চিকিৎসককে দেখান। মনে রাখতে হবে, হোমিওপ্যাথিতে সাইড এফেক্ট প্রায় নেই। তবে শিশু যদি সুস্থ-সবল হয়, শারীরিকভাবে কর্মক্ষম ও চঞ্চল থাকে, তাহলে তার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। □

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি গ্রহণে মুসলমান সমাজের ভিন্ন সুর কেন?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

১৩১২ বঙ্গাব্দে যেমন রবি ঠাকুর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'তে খোলাখুলি প্রশ্ন করেন, ''যাহাতে মামলা মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচার প্রণালীতে সালিশ নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত?''

আজ যদি ভারতের মুসলিম সমাজের জন্য জিজ্ঞাসা করি, তবে তো বলব , না, সাধ্যাতীত নয়। কারণ দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সূচিত হচ্ছে। এতদিন শরিয়ত আইন এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ছিল শাসক এবং শোষিতের। যাদের মধ্যে ছিল উচ্চ দূরত্ব। তাই শরিয়ত বিধি জীবনহীন শুষ্ক আইন প্রণালী মুসলিম সমাজের জন্য অনিবার্য করেছিল। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা ভাবতে ভাবতে তাই কালান্তরের ক'টা ছত্র মনে পড়ল, '' নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এইযে ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। সমাজে উচিত অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, একথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়...।''

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কি সবাই মেনে নিচ্ছে? ১ মে, ২০২২- ভারতের মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (মিম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি যখন দেশের হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে কটাক্ষ করছেন তখন একই নিঃশ্বাসে এক হাত নিয়ে নিলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) বিষয়ে। উনি স্পষ্ট বলেছিলেন, ''আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে।'' এই 'আমরা'এক্ষেত্রে আইনজীবী মহল নয়, এক দ্বিতীয় সত্তা, যার নাম ইসলাম। বা আরও স্পষ্ট করলে মোল্লাবাদ যারা ভারতের প্রগতিশীল মুসলমানদের পথে অন্তরায়। তারা দড়ি ধরে মধ্যযুগীয় তমসায় পুরো মুসলমান সমাজকে দম বন্ধ রাখতে চায়,তাই ইউনিফর্ম সিভিল কোডের প্রসঙ্গ আসলেই হারে রে রে রে রে করে ওঠে। তেলের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে,তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি থমকে থাক। অর্থাৎ প্রতিযুক্তি এটাই, পেট্রোলের মূল্য হ্রাস হলেই মুসলিম সমাজ অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে সবুজ সঙ্কেত দেবে। ওয়েইসি সেদিনের সেই বক্তব্যে বলেছিলেন, ''অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দেশের মানুষকে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত করবে''। যা একপ্রকার অপপ্রচার। আইন ও ধর্মীয় বিশ্বাস কখনও সহাবস্থান করে না। আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রকে একমাত্রিক আইন অনুশাসনে সঙ্ঘবদ্ধ করা এক জাতীয়বাদী সদর্থক পদক্ষেপ কর্মসূচি। ধর্মীয় আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে দেশের আইন ওঠাপড়া করতে পারে না। ভারতবর্ষ অজস্র বিশ্বাসের মাতৃভূমি। তাই বলে কি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধি বিজ্ঞানসম্মত? একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ওয়েইসি যখন এই হুংকার দেন, এর থেকে অনুমেয় ভারতের ইসলাম সমাজের এক বড়ো অংশের মানুষ এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে নিমপাতার মতো হজম করছে।

আমাদের সংসদের উচ্চ কক্ষে ধ্বনিভোটে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি উত্তীর্ণ হয়েছে,যা রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে উন্নততর নিরপেক্ষ সমাজ গঠনে অনেক ধাপ উত্তীর্ণ করবে। নিরপেক্ষভাবে ভারতের প্রকৃত বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের দিকে এ এক অভূতপূর্ব ইঙ্গিত। তাতেই কি স্নায়ু স্পন্দন মন্দ হচ্ছে মোল্লাদের? কারণ এদেশে নিজস্ব ধর্মীয় আইনে অতি অভ্যস্ত ছিল মুসলিম সমাজের সিংহভাগ। বিবাহ, বিচ্ছেদ, সম্পত্তির ভাগ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি নানান বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানকে বন্ধক রেখে নিজস্ব ধর্মীয় আইনে অতি অভ্যস্ত ছিল মুসলিম সমাজ এবং এতে চূড়ান্ত লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতেন

মহিলারা। তাতে এবার পূর্ণচ্ছেদ পড়ল এবং যে কোনও ভারতবাসীর জন্য আইনের অধ্যায় সূচিত করবে ভারতের এক দেশ এক আইন।

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের চতুর্থ অংশে রাজ্যের হাতে কিছু নির্দেশিকা জারি করার ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন। সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারা দেশের সীমারেখার মধ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এই বিষয়ের সঙ্গে কেবলমাত্রই নাগরিক অধিকার জড়িত, ধর্মীয় নয়। যে কোনও অপরাধ যেদিক থেকেই বিচার করা যায় তা অপরাধই থাকে, তা সে বহুবিবাহ হোক বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হোক। তিনি দোষী কিনা তা কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস নির্ধারণ করতে পারে না। সংবিধানের আর্টিকেল ১৪ (এ)-তে নাগরিক সাম্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই কেবল মাত্রই মুসলিমরা যদি সংখ্যালঘু বলে ধর্মীয় বিশ্বাসে আইন নির্ধারণ করে তবে তো ভারতের বেশ কিছু প্রদেশে হিন্দুরাও সংখ্যালঘু। তবে কি পালটা যুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দুরা বিশেষ আইন চাইবেন? ভারতের সংবিধানের মর্যাদা যে ধূলিসাৎ হবে। সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয়, তার জন্যই এক দেশ এক আইন। এবার অনুসন্ধান করতে হবে ঠিক কী কারণে মুসলিম সমাজের অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে এত গাত্রদাহ।

এপ্রিল ২০২২, পাটনাতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক আইনতভাবে একজন মুসলিম ও অমুসলিমের আইনসম্মত বিবাহকে অ-ইসলামিক আখ্যায়িত করলেন। অর্থাৎ আইন সম্পাদিত বিবাহে ওরা বিশ্বাস রাখছেন না। ওই সংগঠনের ওয়েবসাইটে আরবিতে লেখা 'when the government tried to scrap the Sharia law, Hazrat Maulana Minatullah Rahmani sahib organised a conference at Patna in 1963 called TAHAFUZ aimed at preservation of Muslim Personal Law.'' তাই এর থেকে স্পষ্ট, এই বোর্ড সরাসরি ভারতীয় সংবিধানকে চোখে চোখ রেখে শাসানি দেয়। তারা ভারতীয়, ভারতের যাবতীয় নাগরিক স্বচ্ছন্দ উপভোগ করবে কিন্তু ভারতের আইনকে ধর্মীয় অজুহাতে গ্রহণ করবে না। দেশের মধ্যেই আরও একটা আইনের দেশ থাকবে কেবলমাত্র মুসলিম সমাজের জন্য—এর চেয়ে বড়ো অসাংবিধানিক ধর্মঠেসা আবদার কোনও গণতান্ত্রিক আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রে হতে পারে না।

যারা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির নামে ছটফট করছে তাদের পার্সোনাল ল' বোর্ডেরই তো নানান ফিকির। জটিলতা। প্রথমত এটাই পরিষ্কার নয় কারা এই বোর্ডের উপর কর্তৃত্ব রাখেন --- পাসমান্দা মুসলিম অর্থাৎ যারা ইন্ডিজেনাস নাকি আসরাফ (যারা আরবিক সংস্কৃতিতে নিপুণ)? অনেক সময়ই অভিযোগ আসে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দাপট প্রথমের উপর অধিক। কিন্তু ইসলাম আইনে Urf-এর উল্লেখ রয়েছে যা একজন আঞ্চলিক মুসলিমকে তার নিজস্ব রেওয়াজ মানতে অনুমতি দেয়। অর্থাৎ গোড়ায় গলদ। বোর্ডের কর্তৃত্ববিধিতেই নিরপেক্ষতা নেই। তাছাড়াও বোর্ডের চেয়ারম্যান সর্বদা সিয়া সম্প্রদায়ের হন যারা ভারতের সবচেয়ে মাইনর মুসলিম ক্লাস। এরা সংখ্যার হিসেবে ফিরকাদের চাইতেও কম। সিয়ারা এক্ষেত্রে সুন্নিদের সঙ্গে সমানাধিকার নিচ্ছে। আরও অদ্ভুত বিষয় হলো, মুসলিমদের মধ্যে আরও অনেক সাবক্লাস উপস্থিত যেমন সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মুঘল,কুজড়া(ফল বিক্রেতা), বুক্কার (তাঁতি), ধুনিয়া, দর্জি, মিরাশি, নাট ইত্যাদি। পার্সোনাল ল' বোর্ড এদের প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ মনেই করে না। অর্থাৎ ওদের আইন সংসদেই গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতা নেই। সুতরাং এদের তৈরি আইন কেমন করে মুসলমান সমাজকে প্রগতির দিশা দেখাবে।

মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের অফিস আধিকারিকরাও বংশ পরম্পরায় কর্মরত, যা আদতে কোরানের পরিপন্থী। কারণ কোরানেও উল্লেখ রয়েছে কাউন্সিল গঠন মারফত দায়িত্ব বণ্টন করা উচিত। তাই ভারতের মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড আসলে নিজের বেনিয়মেই চলে। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই অনেক ক্ষেত্রে বৈঠক ব্যতিরেকে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত নেন। তাই বোর্ড যদি মুসলিম সমাজের নাগরিক আইন সম্পন্ন করে তবে তা মধ্যযুগের অবসান ঘটাবে না। রাষ্ট্র হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের দায়িত্ব এই স্বৈরাচারী আইন থেকে ভারতের মুসলিমদের মুক্ত করে অভিন্ন নিরপেক্ষ আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠা করা। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ভোগ্য হিসেবে এবং সেকেন্ড জেন্ডারেই অবনমিত অবদমিত করা। যার জ্বলন্ত উদাহরণ নভেম্বর ২০২২-এ। ল' বোর্ড স্বভঙ্গিমায় কী সুন্দর বলে দিল একজন মুসলিম মহিলার 'খুলা' পাওয়ার জোরালো কোনও অধিকার নেই। তা নির্ধারণ ও নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র সেই মহিলার স্বামী। খুলা হচ্ছে একজন মহিলা যদি স্বেচ্ছায় বিবাহবিচ্ছেদ চান, তিনি পাবেন কী পাবেন না তা নির্ধারণ করবে তার স্বামী! কিন্তু স্বামী চাইলেই তালাক দিতে পারতেন এতদিন পর্যন্ত (তিন তালাক বিল রদ লাগু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)। এই অদ্ভুত পার্সোনাল আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন কেরালা হাইকোর্ট। গত ৩ নভেম্বর জাস্টিস এ মুহাম্মাদ মুস্তাক এবং জাস্টিস সি এস ডায়াস কেরালা হাইকোর্টে রায় দেন ''ইন দ্য অ্যাবসেন্স অব এনি মেকানিজম ইন দ্য কান্ট্রি টু রেকগনাইজ দ্য টারমিনেশন অব ম্যারেজ অ্যাট দ্য ইন্সট্যান্স অব দ্য ওয়াইফ হোয়েন দ্য হাজব্যান্ড রিফিউসেস টু গিভ কনসেন্ট, দ্য কোর্ট ক্যান সিম্পলি হোল্ড দ্যাট 'খুলা' ক্যান বি ইনভোকড্ উইদাউট কনজাংশন অব দ্য হাজব্যান্ড।'' এবং স্পষ্ট রায় দেন, ''দিস ইজ আ টিপিক্যাল রিভিউ পোর্টেয়িং দ্যাট মুসলিম উওমেন আর সাবঅর্ডিনেট টু দ্য উইল অব মেল কাউন্টারপার্টস।'' এই লিঙ্গবৈষম্য মুসলিম সমাজের প্রতি পদক্ষেপেই। নিজের অধিকার রক্ষার লড়াইতে ক'জন আদালত পর্যন্ত রাস্তা জানেন?

শাহবানো তিন তালাকের পর একদিন খোরপোষের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তথাপিও সেদিন মুসলিম ভোটব্যাংক পাছে ফসকে যায় তাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে মাথানত করতে হয়েছিল পার্সোনাল ল'-এর কাছে। স্বাধীনতার এত বছর পর মুসলিম সমাজে তাৎক্ষণিক তিনতালাক রদের মধ্য দিয়েই ভারত সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ফিতা কেটেছিল। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য যদি প্রধান হয় তবে তা ভোটসর্বস্ব কার্যক্রমে সীমিত থাকে না। আজকের এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ফলে মুসলমান সমাজের বৃহদংশের উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তির মালিকানা অংশীদারিত্বে যে ঘোরালো ধাঁধালো জটিল শরিয়ত নিয়ম ছিল তার অবসান ঘটবে। প্রথমত, জন্মগত সূত্রে অধিকার বিষয়টাই শরিয়ত আইনে বলা নেই। মৃত্যুপরবর্তী অধ্যায়েই পরিবারের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার অবকাশ আছে শরিয়ত আইনে। যেখানে একাধিক জটিলতা, মারপ্যাঁচ। এবং যেহেতু বহুবিবাহ এতদিন পর্যন্ত আইনসিদ্ধ ছিল ফলে উত্তরাধিকারের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই

Shah Bano Case: A Turning Point In Modern India

জটিল। কিন্তু সে অধ্যায় আইনগতভাবে সমাপ্ত হচ্ছে এই বিধির ফলে। একদিকে বহুবিবাহ যেমন আইন বিরুদ্ধ হলো তেমনই উত্তরাধিকার বিষয়টাও হবে ফ্যামিলি ট্রি নির্ভর। সম্পত্তির বণ্টনে আগে যেটা ছিল তাতে একজন স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেক শেয়ার নিতে পারবেন যদি তারা নিঃসন্তান হন এবং সন্তান থাকলে তা হবে এক অষ্টাংশ। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্য স্পষ্ট। তাছাড়াও 'ডকট্রিন অব রিপ্রেজেন্টেশন' বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ছিল। যা মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের আওতায় ছিল না। ধরা যাক, এক জন ব্যক্তি A, যার দুটি পুত্র B এবং B-এর দুটি সন্তান D, E এবং C-এরও দুটি সন্তান F এবং G , যদি A-এর জীবদ্দশায় B-এর মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে কী হবে? সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র C, A-র সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে। B-এর সন্তানদ্বয় A র সম্পত্তির কোনও অংশই পাবে না। এ তো একরকম বৈষম্য এবং জটিলতার ইন্ধন ক্ষেত্র ছিল। এইসব ছুঁতোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির মহিলা সদস্যদের সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হতো এবং অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের ভীতিতে তারাও অনেক সময় বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার সাহস পেতেন না। কখনও ভোগ্যবস্তুর মতো নীরবে সংসারে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হতেন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ফলে পরিবারের একজন বঞ্চিত সদস্য আইনের বল ও সহায়তা পাবেন। যে আইনে শরিয়ত একপেশে নিষ্পেষণমূলক বিধি নেই বরং ন্যায্য যুক্তিতে রচিত আইন যা রাষ্ট্রীয় পরিসরে একজন নাগরিককে মর্যাদা দেবে তার সুব্যবস্থা বর্ণিত।

মোল্লাবাদের এতে অসন্তোষ হবে তা স্বাভাবিক, কারণ দমননীতির অবরুদ্ধতা ভাঙলে, বৈষম্য দূর হলেই তো তা মোল্লাবাদের বিষদাঁত ভাঙতে পারবে। শরিয়ত আইন ক'জন মুসলিম সম্পূর্ণ রপ্ত করতে পেরেছিলেন? সবটাই ধর্মযাজকের বিধানের ভিত্তিতে হতো। তাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করার সাহস রাখত না। তাই আজ যদি আধুনিকমনস্ক ভারত নাগরিক জীবনে সবাইকে এক আইনি সুখ পরিচর্যা ও প্রতিরক্ষা দিতে পারে তা শরিয়তের ভীতি প্রদর্শনমূলক প্রতিপত্তির অবসান ঘটাবে। যা অবশ্যই কিছু মুসলিমের গাত্রদাহের কারণ। জাস্টিস বিচু কুরিয়ান থমাস (কেরালা হাইকোর্ট) ২০২২-এর নভেম্বরে এক রায় দেন যেখানে তিনি উল্লেখ করলেন, ''ম্যারেজ বিটুইন মুসলিমস আন্ডার পার্সোনাল ল ইজ নট এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য সুইপ অব দ্য পস্কো অ্যাক্ট। ইফ ওয়ান অব দ্য পার্টিজ টু দ্য ম্যারেজ ইজ মাইনর, ইরেসপেক্টিভ অব দ্য ভ্যালিডিটি অর আদারওয়াইজ অব দ্য ম্যারেজ, অফেন্সেজ আন্ডার দ্য পস্কো অ্যাক্ট উইল অ্যাপ্লাই''। মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ এক অহরহ বিষয় ছিল। অভিযোগ কে করবে? সবাই যে শরিয়তে মাথা বেচে বসে আছে। কিন্তু মহামান্য কেরালা হাইকোর্টের এই রায় নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী।

শরিয়ত আইন আইনের চোখে ধোপে টেকে না। তাই শাহবানো থেকে পস্কো অ্যাক্ট সবেতেই তো ভারতীয় আইন বিচারকক্ষে যুক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করে। এক বৃহৎ মুসলিম সমাজ শরিয়ত বিধিতে ভীত থাকত, পাছে তারা সমাজচ্যুত হয়। সে পর্বের আইনি রদ হয়েছে। বহুবিবাহে একজন হিন্দুও যতটা দোষী, একজন মুসলমানও তাই। শরিয়তের দোহাই দিয়ে তাই নিজস্ব নাগরিক আইন উপভোগ করার দিন শেষ। যেকোনও নাগরিক আইন সবার জন্যই অভিন্ন। তাতে ধর্মীয় বিধির নাক গলানোর অবকাশ থাকছে না।

ভারত বহু জনগোষ্ঠীর দেশ। তাই তো অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আরও বেশি করে প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেকেই যদি স্বতন্ত্র ধর্মীয় বা আঞ্চলিক আইনে চলতে চায়, তাহলে তাতে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন নামক বস্তুটি লুপ্ত হয়। ভারতের আইন সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকারের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল। নাগরিক স্বাধীনতা ভারতে যে মাত্রায় উপভোগ করা যায় তা বিশ্বের হাতে গোনা কিছু দেশেই সম্ভব। এর পরেও যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির নামে গাত্রদাহ হয় তবে তা একটা উপলক্ষ্য, যে উপলক্ষ্যে মোল্লাবাদ টিকে থাকতে চায়। শরিয়ত আইন ছিল বটে কিন্তু ন্যায় দিতে পারত না। তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উত্থান। কারণ প্রতিকার ছাড়া ক্ষত নিয়ে ভারতের মুসলিম সমাজ থাকবে কেন? এই আইন কেবল আইন বলেই মূল্যবান নয়। এ তো একটা আস্ত জীবন অধিকার। কারণ রাষ্ট্র হিসেবে ভারত নীতির প্রশ্নে কোনও মধ্যস্থতা করতে নারাজ। □

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে হাঁটু কাঁপছে বিরোধীদের

নিখিল চিত্রকর

প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। পর্দার আড়াল থেকে অশ্রুপূর্ণ মুখগুলোর নীরব ধন্যবাদ পেল তাঁর সরকার। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে তিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রথমটি অযোধ্যায় রাম জন্মভূমির পুনরুদ্ধার, দ্বিতীয়টি জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ। আর তৃতীয়টি বহুচর্চিত ও বহু প্রতীক্ষিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রণয়ন। এক দেশ-এক আইন।

এবার সারা দেশের সমস্ত ধর্ম, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে এক আইনের পরিধিতে নিয়ে আসার পদক্ষেপ শুরু হলো দ্বিধাহীনভাবে। দ্বিধাহীন বলার কারণ এর আগে ১৯৪৯ সালে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে প্রথম বিতর্ক দেখা দেয়। সেবার প্রসঙ্গটি অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। ১৯৫১ ও ৫৪ সালে এই বিতর্ক পুনরায় উত্থাপিত হয়। সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু সংসদ সদস্যরা কোনও ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারায় এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণের ভার রাজ্যগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার জেরেই তৈরি হয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক, পরস্পরের থেকে আলাদা বিভিন্ন পার্সোনাল ল বোর্ড। এভাবে নেহরুর ভারত একাত্মভাবের দর্শন থেকে দলছুট হয়ে বহুত্ববাদের বেড়াজালে আটক হয়ে রইল। আর ভিন্ন পার্সোনাল ল'এর জাঁতাকলে পিষে এদেশের অহিন্দু সমাজ বিশেষ করে মুসলমান মহিলাদের জীবন হয়ে উঠল নরক।

একটা দেশের প্রশাসনিক পরিকাঠামো মজবুত রাখতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন এমন একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ঝুলিয়ে রাখা হলো। ১৯৯৮-এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে তখনও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে প্রস্তাব আনা

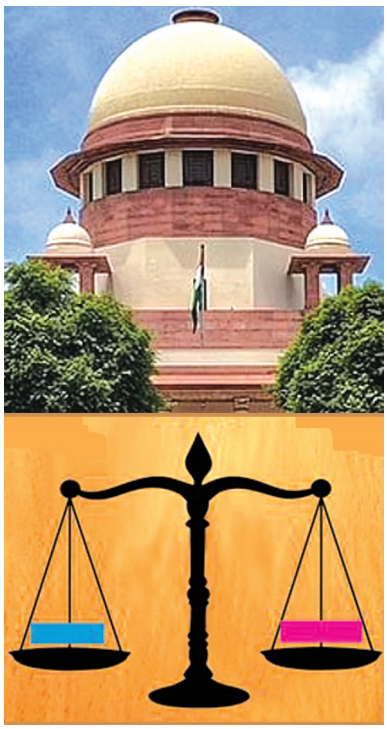

হয়েছিল সংসদে। কিন্তু সেদিনও বিরোধীদের নানারকম বিরোধিতায় তা কার্যকর করা যায়নি। মোদী জমানায় সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটল।

বিজেপি ছাড়া অন্য যে দলগুলি কেন্দ্রে এসেছে তারাই সিউডো সেকুলারিজমের আড়ালে দেশকে এক একটা ইউনিটে বেঁধে রাখতে চেয়েছে। কারণ তাদের কাছে ভারত নয়, ভোটব্যাংক ছিল প্রথম প্রায়োরিটি। তাই এদেশের আইন ছিল অনেকটা 'হযবরল' গোছের। কারও জন্য ব্রিটিশ আইন, কোথাও শরিয়া আইন, এমনকী দেশের কোনও কোনও অংশে বিধানদাতারা পর্তুগিজ বা ফরাসি আইন অনুসরণ করতে বাধ্য হন। বিরোধী রাজনীতির ঘৃণ্য আশকারা, দলাদলির কারণে সেই সুযোগে মাথাচাড়া দেয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। কাশ্মীর হোক বা কেরল এতদিন সর্বত্র দেশবিরোধী কার্যকলাপের সাক্ষী থেকেছি আমরা। অথচ মোল্লাবাদের ঘুঘুর বাসা ভাঙা যায়নি। কারণ সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতো পার্সোনাল ল' বোর্ডগুলি।

সংসদে 'প্রাইভেট মেম্বার বিল'(বেসরকারি বিল) হিসেবে ধ্বনিভোটে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছে বিরোধীরা যেন নর্দমায় নোংরা সাফ করতে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। সবচেয়ে বেশি হইহল্লা শুরু করেছে মিম, জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দের মতো র‍্যাডিক্যাল মুসলিম সংগঠনগুলি। মিমের প্রেসিডেন্ট আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেই দিয়েছেন, এটা ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরএসএস ও বিজেপির চক্রান্ত। তার আশঙ্কা ইসলামীয় সংস্কৃতিকে আবছা করতে ময়দানে নেমেছে জাতীয়তাবাদী দল। তারা এখন থেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। কারণ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু হলে সবার প্রথমে ধাক্কা খাবে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। প্রাসঙ্গিকতা হারাবে শরিয়ত সিস্টেমের মোড়লরা। যারা এতদিন ধরে তিন তালাক, হালালা নিকাহ-সহ মুসলমান মেয়েদের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে নিজেদের সংস্কৃতির অঙ্গ বলে চালিয়ে এসেছে। শরিয়া, হাদিশের দোহাই দিয়ে দশ বাই দশের হারেমে বিয়ে করা বউকে বাঁদির জীবন কাটাতে বাধ্য করেছে।

কয়েকমাস আগেই হিজাব নিয়ে হাওয়া গরম করেছিল কট্টর মোল্লাবাদপন্থীরা। কারণ কর্ণাটকের আদালত বলেছিল 'হিজাব পরাটা ইসলামে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রথা নয়' (hijab is not an essetial religious practice in islam)। এর পরেই জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দের প্রেসিডেন্ট তাদের সভামঞ্চ থেকে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন 'ইসলাম খতরে মে হ্যায়।' সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজ যখন মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সমসাময়িক যুগের সঙ্গে পা মেলাতে চাইছে, তখন এদেশের

রক্ষণশীল মুসলমানরা বস্তাপচা রেওয়াজ আঁকড়ে ধরে মুসলিম মেয়েদের আরও বেশি করে বোরখার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। পাকিস্তান-সহ বিশ্বের অন্যান্য স্টেডিয়ামে খেলার সময় দর্শকদের দেখে বোঝাই যায় না যে কোনও মুসলিম দেশে খেলা হচ্ছে। সেখানকার অধিকাংশ মেয়েরা এতটাই মর্ডানাইজড্। আসলে মাদানি, ওয়েইসিরা মুসলিম নারী সমাজকে চিরকাল আলোর পিছনেই রেখে দিতে চায়। তাতে সানাইয়ের পোঁ ধরে ভোটব্যাংকের গুড় খাওয়া রাজনীতির সওদাগরেরা। তাই ইসলামি মোল্লাবাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইরানের মেয়েরা যখন রাজপথে হিজাব পোড়ায়, এদেশের মুসলিমরা তাতে টুঁ শব্দটিও করে না। 'দুধেল গাই' বলে কোলাকুলি করা তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলোও ময়দানে নামে না। কারণ ভোট বড়ো বালাই!

কিন্তু এবারের শক্তিশেলটা এসেছে সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট থেকে। কেন? কারণ সারাবছর অসংখ্য মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াচ্ছে, যেখানে মুসলমান নারীরা তালাকের পর খোরপোশ না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের বেঁধে দেওয়া আইন পুরুষদের প্রতি চরম পক্ষপাতদুষ্ট। মুসলমান মহিলাদের স্বার্থ সেই 'একুশে আইনে' আদৌ সুরক্ষিত নয়। তার সুযোগ নিয়ে মুসলমান পুরুষরা বিনা কারণে তালাক দেয়, যথেচ্ছ বিয়ে করে এবং পরবর্তীতে প্রাক্তন স্ত্রীদের ভরণপোষণের কোনও অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর নির্বিশেষে অসংখ্য মুসলমান মহিলা বহু বছর ধরে এই বৈষম্যের শিকার হয়েই চলেছে। ভারতের আদালতে মামলা হয়, কিন্তু ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় তার নিষ্পত্তি হয় না। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের মারপ্যাঁচে সেসবের মীমাংসা হয় না। সেই প্রসঙ্গেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত করে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অর্থ সারা দেশের সব ধর্মের নাগরিকদের জন্য এক আইন, যা সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বিষয় যেমন, বিবাহ, উত্তরাধিকার, দত্তক ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই লাগু হবে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড আইনত লাগু হলে শরিয়া আইন বা কোনও সম্প্রদায়ের কোনও পার্সোনাল ল' বোর্ডের অস্তিত্ব থাকবে না। ওয়েইসিরা অবশ্য তিনতালাক, হালালা নিকাহের মতো শরিয়া আইনে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছে। খোদ মিম প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, ''মুসলিমদের কাছে বিবাহ একটি চুক্তি।'' বলিউডে নব্বইয়ের দশকে অনিল কাপুর-কাজল অভিনীত একটি ফিল্মের কথা মনে পড়ে। নায়ক সেখানে নায়িকার সঙ্গে একটি চুক্তিভিত্তিক বিয়ে করে। ঠিক হয় বিয়েটা হবে একবছরের। এই একবছরে স্বামীর যদি মনে হয় যে মেয়েটির সঙ্গে সারাজীবন ঘর করা যায় তবে বিয়েটা পার্মানেন্ট হবে, নচেৎ তালাক! ওয়েইসির হিসেবে তাদের সমাজে মেয়েদেরও ঠিক একইভাবে দাঁড়িপাল্লায় মাপা হয় ইসলামি আইনের আওতায়। ১৯৮৫ সালের শাহবানু মামলার কথা এখনও অনেকেরই মনে আছে। বৃদ্ধা শাহবানুকে তিন তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল তাঁর স্বামী। সেই সময় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, ভারতীয় দণ্ডবিধিতে খোরপোশ পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে একজন বিবাহ বিচ্ছিন্ন মুসলিম নারীর। সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। সঙ্গত কারণেই ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ভিত মজবুত হওয়া দরকার।

এই ২০১৯ সালের আগেও কাশ্মীরের স্থানীয় হিন্দু আইন ছিল কেন্দ্রীয় আইনের থেকে আলাদা। এই সেদিনও জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৩৫ সালের শরিয়া আইন বহাল ছিল। সেখানকার মুসলমানদের প্রথাগত আইন আবার দেশের বাকি অংশের মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন থেকে একেবারে আলাদা। মুসলমানদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রি আইন এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, ওড়িশায় আবার তা বাধ্যতামূলক নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে দুশো'র বেশি জনজাতি নিজস্ব বিভিন্ন প্রথাগত আইন মেনে চলেন। ভারতের হিন্দু আইন সংস্কারের পর নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মিজোরামের স্থানীয় প্রথাগুলিকেই সাংবিধানিক সুরক্ষা দিয়ে ব্যক্তিগত আইনের তকমা দেওয়া হয়েছে। এভাবে ভারতের মধ্যে ভিন্নভিন্ন আইন ও প্রথার প্যারামিটার ব্যবহার করে দেশটাকে টুকরো টুকরো করার অভিসন্ধি রচনা করেছে বিরোধীরা। সেই গুড়ে আপাতত বালি।

যেদিন সংসদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ করলেন বিজেপি সাংসদ কিরোড়িলাল মিনা, বিরোধিতা চরমে উঠল। তবে বিরোধীদের অরণ্যেরোদন করেই রণে ভঙ্গ দিতে হলো। ততক্ষণে ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গেছে বিলটি। এবার শুধু আইন হওয়ার অপেক্ষা। এতদিন বিরোধীরা যে সংখ্যালঘু তাস খেলে ভোটের আখের গোছাতো তাতে জল ঢেলে দিল মোদী সরকার। বিরোধীদের সঙ্গ ছাড়লো তামাম মুসলমান নারী সমাজ। তাঁরাও যে মুক্তি চাইছেন। তেতেপুড়ে ষোলোআনা সংস্কারের দিন গুনছে পর্দানশীন নির্যাতিতারা। ■

দক্ষিণবঙ্গ সক্ষমের বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন

সক্ষম দক্ষিমবঙ্গের উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর কলকাতাস্থিত সল্টলেকের ঐকতান প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, দক্ষিণ কলকাতা নোবেল মিশন স্কুলের ডিরেক্টর শ্রীমতী লীনা বর্ধন, সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক অনীখ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্তোত্রপাঠ করেন সুদর্শন রক্ষিত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম। ড. রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে সারা দেশে সক্ষমের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। দিব্যাঙ্গ-ভাই রূপাঞ্জন সেন কী-বোর্ডে রবীন্দ্র সংগীত 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' বাজিয়ে শোনান। শ্রীমতী বর্ধন তাঁর বক্তব্যে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের প্রতি সমাজ ও সরকারের সহমর্মিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের হাত দিয়ে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে নির্ধারিত ছিল বৈজ্ঞানিক পর্ব। সিনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ উজ্জ্বল ব্যানার্জি মানসিক রোগ বিষয়ে, মনোবিজ্ঞানী ডাঃ সুনন্দা ব্যানার্জি অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার বিষয়ে, বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাবিদ সুব্রত বসু বিভিন্ন শেখার অক্ষমতা বিষয়ে, কলসালট্যান্ট সাইকোলজিস্ট ডাঃ সূর্যজ্যোতি চৌধুরী রক্তজনিত বিভিন্ন অসুখের বিষয়ে এবং ডাঃ সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত দিব্যাঙ্গদের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অন্তিম পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে ২০ জনেরও বেশি দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন অংশগ্রহণ করে। তারা নাচ, গান এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীতবাদ্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে ৩০ জন দিব্যাঙ্গ-সহ ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাঃ সাত্যকি দাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ তরুণ সরকার। বন্দেমাতরম্ গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সেবা ভারতীর রক্তদান শিবির

গত ৪ ডিসেম্বর বাঁকুড়া সেবা ভারতীর উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের শুভারম্ভ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা সঙ্ঘচালক জয়ন্ত কুমার শীল। ৬৬ জন পুরুষ ও ৯ জন মহিলা-সহ ৭৫ জন রক্ত দান করেন। সংগৃহীত রক্ত বিষ্ণুপুর ব্লাড ব্যাংকে প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন থ্যালাসেমিয়া গার্জেন সোসাইটির প্রবীর কুমার সেন, বিষ্ণুপুর স্বেচ্ছারক্তদাতা সমিতির দেবকুমার ভট্টাচার্য।

মালদহে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ১৩ ডিসেম্বর মালদা শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ রায়। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার বিভাগ প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহপ্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তরুণ কুমার পণ্ডিত। শ্রীমণ্ডল স্বস্তিকার প্রচার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

পাঠকদের মধ্যে থেকে তাঁদের অনুভবের কথা বলেন রামেশ্বর পাল, গোপাল কুণ্ডু ও প্রবীর কুমার মিত্র। সমাপ্তি ভাষণ রাখেন বিষ্ণুপদ রায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি পরেশ চন্দ্র সরকার। রাষ্ট্রগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সোনারপুরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বুকস্টল

গত ৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর রেল কোয়ার্টার পার্কে শুরু হলো ৩৩ তম সোনারপুর বইমেলা। দশদিনব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। এবারের বইমেলার থিম কোচবিহার জেলা। শতাধিক নামিদামি বুকস্টল, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাশাপাশি ছিল বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বুকস্টল। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বুকস্টলের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আকতার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, সুন্দরবনের অক্সিজেনম্যান সৌমিত্র মণ্ডল এবং ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মনোরঞ্জন জোদ্দার।

উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক সৈকত মণ্ডল, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মৃধা, জেলা প্রকাশন প্রমুখ সহদেব সিং, বারুইপুর মহকুমা সম্পাদক সমীর মাল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নগর সঙ্ঘচালক রামকৃষ্ণ ব্যানার্জি প্রমুখ।

স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষানুরাগী মানুষজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের প্রখ্যাত সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার উদ্যোগে গত ৪ ডিসেম্বর সিউড়ি শহরের শ্রীমত্যা প্রভারানি নন্দীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী বরদানন্দ ব্রহ্মচারী। ওঙ্কারধ্বনি ও গীতার শ্লোক পাঠ করা হয়। গীতাপাঠ করে ড. দেবাশিস কর্মকার। প্রভারানি মাতাকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করেন শ্যামলী দত্ত। মানপত্র পাঠ করেন আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। গীতা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন জীবন মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমত্যা অলকা গাঙ্গুলি ও অসীমা মুখোপাধ্যায়। উত্তরীয়রূপে নামাবলী, পরিধেয় বস্ত্র, ফল ও মিষ্টান্ন দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য এবং ধন্যবাদ জানান শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

উলুবেড়িয়ায় আরোগ্য ভারতীর স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার ফুলেশ্বর দুর্গাবাড়িতে আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে গত ২৬ নভেম্বর এক স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক গৌতম পাল, কলকাতার কিশোরী বিকাশ প্রমুখ বিদিশা মৌলিক, প্রান্ত কিশোরী বিকাশ প্রমুখ বিভাসা মৌলিক, আরোগ্য ভারতীর হাওড়া জেলা সংযোজক বিশ্বরূপ খাঁড়া, আরোগ্য ভারতীর বিভাগ সংযোজক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক মলয় সামন্ত। শিবিরে প্রতিদিনের দিনচর্যায় বিনা ওষুধে কীভাবে শরীর সুস্থ রাখ যায়, বিভিন্ন ভেষজের গুণাগুণ ও উপকারিতা, প্রতিদিনের জীবনযাপনে কী করা বা না করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আকুপাংচারের মাধ্যমে রোগ নিরাময় পদ্ধতি এবং বিভিন্ন যোগব্যায়াম হাতে-কলমে শেখানো হয়। পুরুষ ও মহিলা-সহ ৫১ জন শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে বাগবাজারে গীতা জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৪ নভেম্বর মোক্ষদা একাদশী তিথিতে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গীতা জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। চারশতাধিক গীতাপ্রেমী মানুষ সমবেতকণ্ঠে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করেন। উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ড. গঙ্গাধর কর, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তন্ময় ভট্টাচার্য এবং গৌড়ীয় মঠের ভক্তিবৈভববৈষ্ণব মহারাজ। অনুষ্ঠানে 'সংস্কৃত ব্যবহার সামগ্রী' পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।

ধর্ম জিজ্ঞাসা—তিন

হিন্দু ধর্মের অমৃত অভিযাত্রা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বিদেহরাজ জনক। রাজা হয়েও প্রায় ঋষির জীবন। জনক প্রায়শই করতেন যজ্ঞের আয়োজন। যজ্ঞে আসা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দিতেন অপরিমেয় দান-দক্ষিণা। স্বভাবতই তাঁর যজ্ঞে আসতেন অসংখ্য যাজ্ঞিক, ঋষি, পুরোহিত।

রাজা জনক প্রাজ্ঞ। যজ্ঞসভায় বহু সময় তিনি নিজেই অবতারণা করতেন নানা প্রসঙ্গের। সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতেন বুধমণ্ডলী। সকলেই কুশলী শাস্ত্রবিদ। তাঁদের শাণিত যুক্তি-প্রতিযুক্তির ঝলকে আলোকিত যজ্ঞস্থলকে মনে হতো যেন অজস্র নক্ষত্র শোভিত শরতের নির্মল আকাশ।

এক যজ্ঞে সেবার ব্রহ্মতত্ত্ব জানার বাসনা জাগে রাজা জনকের মনে। বাসনার কথা সরাসরি বললেন না জনক। বরং সৃষ্টি করলেন এব প্রহেলিকাময় পরিবেশের।

তাঁর আদেশে যজ্ঞস্থলের পাশেই রাখা হলো হাজার নধর গাভী। তাদের প্রতি শৃঙ্গের সঙ্গে বাঁধা ছিল দশপাদ করে স্বর্ণমুদ্রা (দশপাদ = আনুমানিক ৬০ গ্রাম)।

রাজা জনক যজ্ঞস্থলে দাঁড়িয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে বলেন, ওই গাভীগুলি আমি দান করতে চাই কেবলমাত্র একজনকেই। জানি আপনারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ। তবুও আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি গ্রহণ করুন এই গাভীগুলি। নিয়ে যান নিজ আশ্রমে।

রাজা জনকের এই কথায় অতি ঠাণ্ডায় জমাটবাঁধা বরফের মতোই নীরবতা চারিদিকে। কেউই সাহস করে নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলে গাভীগুলি নিতে এগিয়ে এলেন না।

রাজা জনক হতাশ। মধ্যাহ্নে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের মতোই অন্ধকার তাঁর মুখ। কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি রাজ্য থেকে এতো শাস্ত্রবেত্তাদের মধ্যে একজনও তাহলে ব্রহ্মজ্ঞ নন! তাহলে কার কাছে তিনি শুনবেন ব্রহ্মতত্ত্বের কথা?

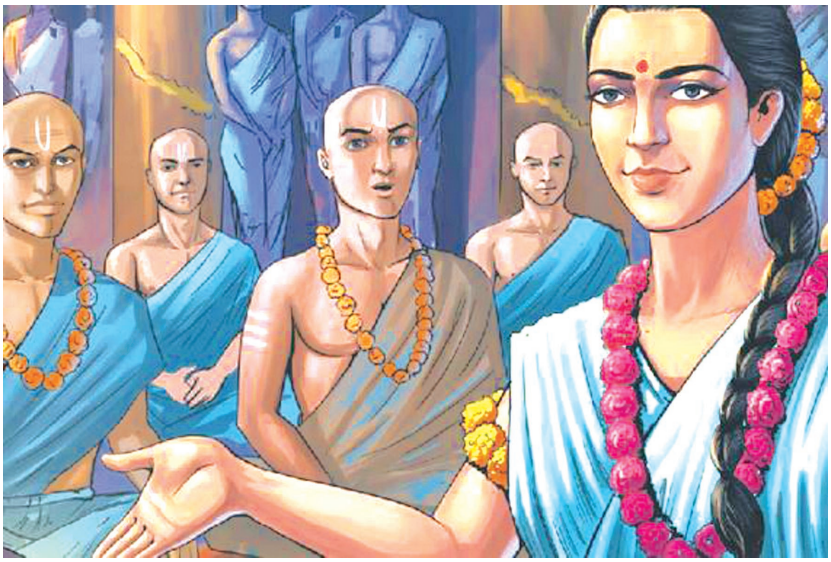

স্তব্ধ সকলেই। হঠাৎই যেন গ্রহণ শেষ। পূর্ণ ভাস্করের দীপ্তিতে আলোকিত যজ্ঞভূমি। এগিয়ে এলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। ঋষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য তিনি। কুরু-পাঞ্চাল নয়। তিনি সম্ভবত বিদেহ দেশেরই ব্রাহ্মণ। চারটি বেদেই সমান কৃতবিদ্য। তাই বিশেষ করে ঋকবেদের একটি শাখার প্রবর্তক হয়েও এক শিষ্যকে বললেন, সৌম্য সামশ্রব (সামবেদ অধ্যয়নকারীর নাম এটি), তুমি এই গাভীগুলি আশ্রমে নিয়ে যাও।

অত্যন্ত শান্তভাবেই কথাগুলি বলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি তেজোময়, কিন্তু তাঁর এই কথাগুলির মধ্যে নেই এতটুকু অহমিকা। অত্যন্ত বিনীতভাবেই উচ্চারণ করেন কথাগুলি। কিন্তু তার মধ্যে ছিল এক ধরনের দৃঢ়তা। তাই নিস্তব্ধ সকলেই। যেন নিস্তরঙ্গ শান্ত সরোবর।

এ স্তব্ধতা ক্ষণকালের। মুখর এবার ব্রাহ্মণরা। বুঝি-বা উদ্ধতও। ব্রাহ্মণ হলেও সেই মুহূর্তে তাঁদের মধ্যে নেই সহিষ্ণুতা, নেই তেমন শ্রদ্ধাবোধ। তাই তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন। তিনিই যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ তার প্রমাণ কোথায়? সে কথা জানতেই যেন সকলের প্রতিনিধি হয়েই অশ্বল নামে একজন হোতা প্রশ্ন করেন কিছুটা ক্রোধের সঙ্গেই, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?

সরাসরি সে কথার উত্তর না দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার। আমার এই গাভীগুলির প্রয়োজন ছিল তাই এগুলি নিয়েছি।

এই কথায় আরও তপ্ত সকলে। অশ্বলও। তবে কিছুটা নম্র অথচ বিজ্ঞ ভাবেই বলেন, আচ্ছা, সমস্ত কিছুরই সমাপ্তি যখন মৃত্যুতে, কেউই যখন অমর নয়, তাহলে যজমান কীভাবে সেই অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে?

এতটুকু না ভেবেই যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, হোতা নামক ঋত্বিক, অগ্নি বা বাক্য দ্বারাই মুক্তি পান যজমান। বাক্যই হলেন যজ্ঞের হোতা। যা বাক্য তাই অগ্নি— তাই মুক্তি। অতিমুক্তি বা সম্পূর্ণ মুক্তি।

প্রসঙ্গত, আচার্য শংকর পরবর্তীকালে তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, মুক্তির ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যে মুক্তি পাওয়া যায় তারই নাম অতিমুক্তি, অর্থাৎ সাধনার দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে পারলে বা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই এড়ানো যায় জন্মান্তরের বন্ধনকে। পাওয়া যায় মুক্তি। ভারতীয় ধর্মসাধনার

অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হলো এই মুক্তি।

যাইহোক, সেদিন জনসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের ওই কথা শোনার পরও থামলেন না অশ্বল। এই না থামার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট নন। কূট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে বিদ্ধ করতে চান। অথবা তিনি তখন প্রশ্নকর্তা নন, একজন জিজ্ঞাসু। জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে নিজের এবং উপস্থিত সকলের মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করার জন্যই তাঁর এই প্রশ্নের অবতারণা। তাঁর প্রশ্ন, সবই যদি অহোরাত্রের অধীন, তার বাইরে যখন কেউ নয়, তখন কেমন করে যজমান সেই অহোরাত্রের হাত থেকে অতিমুক্তি পাবে।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় এবার গুরুত্ব পেল নয়ন বা দৃষ্টি। সেই সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞ করার জন্য হোতা, ঋত্বিক, অধ্বর্যু ইত্যাদি নানা স্তরের পুরোহিত নিয়োগ করা হয় তার তাৎপর্যও প্রকাশ পেল তাঁর উত্তরে। তিনি বললেন, যজমানের মুক্তি হবে অধ্বর্যু পদের ঋত্বিক, চোখ ও আদিত্য দ্বারা। বললেন, চোখই হলো আদিত্য। তাই-ই অধ্বর্যু। তাতেই মুক্তি। অতিমুক্তি।

আবারও প্রশ্ন। সব কিছুই যখন শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অধীন তাহলে তার থেকে মুক্তি মিলবে কীভাবে? পারদর্শী শিক্ষকের মতোই যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, উদ্গাতা নামে ঋত্বিক, বায়ু ও প্রাণ দিয়েই আসবে মুক্তি। এক্ষেত্রে প্রাণই বায়ু, তাই উদ্গাতা এবং তাই মুক্তি। অতিমুক্তি।

---আচ্ছা, এই অন্তরিক্ষকে তো অবলম্বনহীন বলে মনে হয়। তাহলে কীভাবে সেই নিরালম্ব স্বর্গে যাবে যজমান?

—ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক, মন ও চন্দ্রই হলো সেখানে যাওয়ার মাধ্যম। মনই চন্দ্র, তাই ব্রহ্ম, তাই মুক্তি এবং অতিমুক্তি।

---তাহলে কতগুলি ঋক্ দিয়ে যজ্ঞ করবেন হোতা?

—তিনটি।

—কী সেই তিন ঋক্?

—যজ্ঞের সময়ের উচ্চারিত প্রথম মন্ত্র বা অনুবাক্য, যাগের সময়ের মন্ত্র— যাগো বলে যাজ্ঞা এবং শস্যা বা প্রশংসাসূচক ঋক্।

—এই তিনটি দিয়ে কী জয় করা যায়?

---যত কিছু প্রাণী আছে, তাদের সকলকেই।

এবার অশ্বলের প্রশ্ন, তাহলে অধ্বর্যু যজ্ঞে ক'টি আহুতি দেবেন?

—তিনটি।

—কী কী কী?

—অগ্নি যাতে প্রজ্বলিত হয় তার জন্য ঘৃত, সমিধ ইত্যাদি প্রজ্বলিত অগ্নিতে যা আহুতি দিয়ে তীব্র শব্দ হয় সেই মাংস ইত্যাদি এবং আহুতি দেওয়ার পর যা নীচে পড়ে থাকে সেই দুধ, সোম ইত্যাদি।

এইসব আহুতি দিয়ে কী জয় করা যায় জিজ্ঞাসা করলে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যে আহুতিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তা দিয়ে জয় করা যায় সদা দেদীপ্যমান দেবলোককে। কোলাহল পরিপূর্ণ পিতৃলোক জয় করা যায় শব্দ উৎপাদক আহুতি এবং নীচে অবস্থিত নরলোক জয় করা যায় নীচে পড়ে থাকে যে আহুতি—তা দিয়ে।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য জানান, দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট ঋত্বিক ব্রহ্মা একজন দেবতাকে দিয়েই যজ্ঞ রক্ষা করেন— সে দেবতা হলো মন। মন অনন্ত, বিশ্বদেবও তাই। এ কারণে তিনি মন দিয়েই অখণ্ডলোক জয় করেন।

এইভাবে কিছু প্রশ্ন করে তুষ্ট অথবা ক্লান্ত এবং খেই হারিয়ে বসে পড়েন অশ্বল। তারপরও প্রশ্নের বিরাম নেই। একের পর এক আর্তভাগ, ভুজ্য লাহ্যায়নি, উষস্ত, কনোল এবং গার্গী বাচক্নবী উঠে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে থাকেন যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে। কিন্তু সময় যত এগোয় প্রশ্নের রূপও ততই পালটায়। শুরু হয়েছিল যা যাজ্ঞবল্ক্যকে বিদ্ধ করার জন্য, তাঁর জ্ঞানগরিমা পরীক্ষা করার জন্য, ক্রমে তার রূপ বদলাল। প্রশ্ন-শর আর বুক লক্ষ্য করে নয়, ক্রমেই তা যেন তাঁর পাদস্পর্শ করার জন্য বর্ষিত হতে থাকল। উদ্ধত প্রশ্নকর্তারা ক্রমেই পরিণত হতে থাকেন বিনত ছাত্র-শিষ্যে। যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান বা প্রজ্ঞার পরীক্ষা নয়, নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতে অনুসন্ধিৎসুর মতো এক একটি বিষয় জানতে চাইলেন তাঁরা।

তাঁদের এইসব জিজ্ঞাসায় ক্রুদ্ধ না হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যেরকম শান্তভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন তাতে প্রীতই হন বিদেহপতি জনক। যে উদ্দেশ্যে তাঁর এই প্রহেলিকাময় জ্ঞানের অবতারণা তা সিদ্ধ হতে দেখে নীরবেই প্রণতি জানাতে থাকেন তিনি। তাঁর যজ্ঞভূমি যে এভাবে ব্রহ্মজ্ঞ তাপসের শিক্ষাভূমিতে পরিণত হবে তা বোধহয় ছিল তাঁর কল্পনারও অতীত।

অশ্বল প্রশ্ন করা থেকে বিরত হওয়ার পরই উঠে দাঁড়ান জরৎকারু গোত্রের আর্তভাগ। তাঁর জিজ্ঞাসা গ্রহের সংখ্যা কতগুলি এবং অতি গ্রহই বা কয়টি?

এখানে গ্রহ বলতে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলা হয়নি। গ্রহ বলতে বোঝানো হয়েছে গ্রহণ করার মাধ্যম বা ইন্দ্রিয়কে। আর যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তা গৃহীত হয় তাকে বলা হয়েছে অতিগ্রহ।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য জানান, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ, বাক্, মন ও দুটি হাত হলো আটটি গ্রহ। আর আঘ্রাণ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, কামনা ও কর্ম হলো অতিগ্রহ।

—আচ্ছা, এ সমস্তই তো মৃত্যুর বশ। এর বাইরে কি কোনো দেবতা আছেন মৃত্যু যার অধীন?

—অগ্নিই মৃত্যু। জলের অন্ন বা বশ হলো অগ্নি। অর্থাৎ মৃত্যুরূপী অগ্নি বিনষ্ট বা নির্বাপিত হয় জলে। সে কারণে অগ্নি বা মৃত্যু হলো জলের বশ। এই কথাটা যিনি জানেন তাঁর আর মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ তিনি হন পুনর্জন্মরহিত।

এরপর আর্তভাগের জিজ্ঞাসা ছিল মৃত্যুর পর পুরুষ কোথায় যাবে? সন্দেহ নেই এ এক গূঢ় তত্ত্ব। সে তত্ত্ব অধিকারী ছাড়া অন্যকে তা বলা যায় না। অর্থাৎ এটা প্রকাশ্য আলোচনার কোনো বিষয় নয়। তাই আর্তভাগকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে কর্মতত্ত্বর কথা বলেছিলেন তিনি। পুণ্যকর্মে পুণ্যবান হয় মানুষ আর পাপকর্মে হয় পাপী।

তত্ত্ববেত্তা ও শাস্ত্রজ্ঞরা মনে করেন, যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পর একমাত্র কর্মই অবশিষ্ট থাকে। সেই কর্ম অনুসারেই পুণ্যবান বা পাপী মানুষের জন্ম হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই মতের মধ্যে দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হয়েছে। অনেকেরই প্রশ্ন থাকে, একই ভাগবান বা পরমাত্মা থেকে যখন সকলের জন্ম তাহলে এত রূপভেদ কেন? কেন একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যেও কেউ ভালো আবার কেউ মন্দ হয়। সম্ভবত সেই কথাটিই

বলা হয়েছে এই ভাবে। মানুষ তার মর্ত্যজীবনে যেমন কর্ম করে, পরজন্মে বয়ে বেড়াতে হয় সেই কর্মফলই। আর সেই কারণেই ঈশ্বর সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টির এত রূপান্তর। এত ভেদাভেদ। তবে অনেকে মনে করেন, এটি সর্বসম্মত তত্ত্ব নয়। এবং সেই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য সেদিন ওই বিষয়টি নিয়ে আর সকলের সামনে আলোচনা করেননি। তবে তাঁর কথায় আর্তভাগের অন্তর যে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তো বোঝা যায় তাঁর নীরবতায়।

তিনি নীরব হতে সরব হন ভুজু লাহ্যায়নি। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বলেন, বায়ুই ব্যষ্টি, আবার বায়ুই সমষ্টি। জানলে জয় করা যায় পুনর্জন্মকেও।

এবার সরাসরি ব্রহ্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন চক্রের পুত্র উস্বস্ত। তাঁকে এককথায় যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, আত্মাই সকলের অন্তরাত্মা। এই আত্মা ও অন্তরাত্মাই সব কিছুর নিয়ামক। বলেন, সর্বান্তর আত্মাই কেবল অবিনশ্বর। আত্মা ছাড়া আর সবেরই বিনাশ হয়।

একইভাবে কুষীতক বংশের কহোলকে তিনি বলেন, যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন তিনিই সর্বান্তর।

এতক্ষণ সবকিছু শুনছিলেন ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। এবার তাঁর প্রশ্ন, জলে তো সবকিছু ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু জল জড়িয়ে আছে কার সঙ্গে?

—বায়ুর সঙ্গে।

—বায়ু আছে কার সঙ্গে?

—অন্তরিক্ষ লোকের সঙ্গে।

এইভাবে একের পর এক প্রশ্নের শেষে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, দেখ, প্রজাপতিলোক ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে ব্রহ্মলোকের সঙ্গে। গার্গীর আবারও প্রশ্ন, তাহলে ব্রহ্মলোক কার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এবার যাজ্ঞবল্ক্য একটু ক্রুদ্ধই হলেন, বললেন, দেখ, প্রশ্ন করারও একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করলে পরিণতি হয় ভীষণ। তাই অতি প্রশ্ন করো না। শুধু জেনে রাখো, ব্রহ্মলোকই শেষ সীমা।

নতমস্তকে বসে পড়লেন বাচক্নবী গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্যর গুরু আরুণি উদ্দালক এতক্ষণ শুনছিলেন এই প্রশ্নোত্তর। এবার তাঁর জিজ্ঞাসা, ইহলোক, পরলোক ও সর্বভূত গ্রথিত রয়েছে একই সূত্রে। তুমি কি সেই সূত্রের কথা জানো? জানো সেই অক্ষয়াত্মাকে? তা না জেনে তুমি যদি এইসব গাভী নিয়ে যাও তাহলে তোমার এই মাথা বিঘ্নত হবে দেহ থেকে। যাজ্ঞবল্ক্য শান্ত ভাবেই বলেন, হ্যাঁ, আমি জানি এসব।

—শুধু জানি বললে তো হবে না। কী জানো সেটাই এবার বলো?

---বায়ু রূপী সূত্রে বাঁধা ইহলোক, পরলোক ও সবকিছুই। যিনি পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে পৃথক, পৃথিবী তাঁকে জানে না অথচ পৃথিবীই যাঁর শরীর এবং পৃথিবীর অন্তরে থেকে যিনি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই আত্মা। তিনিই অন্তর্যামী। তিনিই অমৃত।

যিনি, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষে থেকে তাদের থেকে পৃথক এবং তাদের নিয়ন্ত্রক তিনিই আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। এই ভাবে একের পর এক উদাহরণের শেষে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'যঃ সর্বেষু-ভূতেষু তিষ্টন্...' যিনি সর্বভূতে থেকেও তার চেয়ে আলাদা তিনিই আত্মা। অন্তর্যামী ও অমৃত। সমস্ত বিষয়েরই নিয়ামক তিনি। এই আত্মা ছাড়া আর সবকিছুরই বিনাশ আছে।

তুষ্ট হলেন উদ্দালক। পূর্ণ হলেন তিনি। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়ান গার্গী। সমবেত সকলকে বলেন, এবার আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব। ইনি যদি তার উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আপনারা কেউই ব্রহ্মবিচারে এঁকে হারাতে পারবেন না।

এরপর সকলের সম্মতি নিয়ে গার্গীর প্রশ্ন, যা ইহলোকের ওপরে, পৃথিবীর নীচে এবং এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে, যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— তা কোন বস্তুতে বর্তমান?

যাজ্ঞবল্ক্য শান্তভাবেই বলেন, এ সবই জড়িত আকাশের সঙ্গে। গার্গী তাঁকে নমস্কার জানিয়ে এবার শেষ প্রশ্ন করেন, ওই আকাশ তাহলে কার সঙ্গে জড়িত?

যাজ্ঞবল্ক্য এখন গম্ভীর অথচ যেন জ্যোতির্ময়। দিব্য বিভা যেন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দেহ থেকে। প্রশান্ত কণ্ঠ তিনি। ব্রাহ্মণগণ বলেন ইনি সেই অক্ষয়। তিনি স্থূল নন, অণু নন, হ্রস্ব বা দীর্ঘও নন, স্নেহবস্তু বা ছায়া, অন্ধকার কী বায়ু বা আকাশ নন। ইনি অ-সঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ। তিনি অপরিময়ে, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত। এই অক্ষরই সব— তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা। এই অক্ষরপুরুষকে না জেনে যে ইহলোক ত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র আর তাঁকে জেনে যিনি দেহত্যাগ করেন— তিনিই ব্রাহ্মণ। এই অক্ষরকে দেখা যায় না— অথচ ইনি সব কিছু দেখেন। তাঁকে শোনা যায় না— কিন্তু তিনি শোনেন। তাঁকে জানা যায় না— অথচ তিনি সব জানেন। তিনি ছাড়া স্রষ্টা নেই, শ্রোতা নেই, নেই কোনো বিজ্ঞাতা। এই অক্ষরেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আকাশ।

এবার গার্গী প্রণত। সমবেত সকলকে বলেন, ব্রহ্ম বিচারে আপনারা কেউ এঁকে পরাজিত করতে পারবেন না। এঁকে প্রণাম করে যদি নিষ্কৃতি পান, জানবেন সেটা পরমসৌভাগ্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ভাবে শেষ হয়েছে ব্রহ্ম সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার একটি পর্ব। জটিল এই পর্ব কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য কথনে— কিছুটা-বা প্রাঞ্জল। জ্ঞানসভায় সেদিন উঠেছিল যেসব জিজ্ঞাসা— যে জিজ্ঞাসা সব মানুষের। সে জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানেই অনাদিকাল থেকে চলছে সনাতন হিন্দুধর্মের অভিযাত্রা।

সনাতন হিন্দুধর্মের চিরন্তন লক্ষ্য জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসা। সব বন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভই জীবনের প্রার্থনা। প্রার্থনা— মৃত্যোর্মামৃতং গময় (বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮)— মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও আমাকে।

অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা জন্মরহিতের— ব্রহ্মকে জানার, কেননা তিনিই 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং/গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোনৃমৃতো ভবতি' (৩।২।৯)— তাঁকে জেনেই সবরকম শোক দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অতিক্রম করা যায়— পাপ পুণ্যকে। অবিদ্যামূলক অহং জ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েই লাভ করা যায় অমৃত।

হিন্দুধর্মের কথা, ব্রহ্মজ্ঞান যা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ছাড়া সংসারের বাঁধন ছেঁড়া যায় না। ব্রহ্ম হলেন পূর্ণতম এবং শুদ্ধতম সত্তা। তাই তাঁকে পেতে বা তাঁর মতো হতে গেলে হতে হবে তাঁরই মতো। অর্জন করতে হবে পূর্ণত্ব বা শুদ্ধত্ব। এটাই হিন্দুধর্মের মর্মবাণী। ◻

জনজাতি যোদ্ধাদের কাছে ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ

কৌশিক রায়

ভারতে প্রথম উপজাতি সমাজের মানুষ দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তাঁর প্রসঙ্গ ধরেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনজাতি সমাজের বীর-বীরাঙ্গনাদের শৌর্যগাথা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে অবশ্যই মনে করতে হবে। দেশপ্রেমিক এই জনজাতি যোদ্ধাদের আত্মবলিদান ব্রিটিশ রাজশক্তির নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদ ও সিংহাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সাঁওতাল ও মুণ্ডা বিদ্রোহের সাহসী ও উদ্ভাবনী নেতা হিসেবে আমরা সিদো-কানহু ও বীরসা মুণ্ডার নাম অবশ্যই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবো। তবে তাঁদের পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাভ এবং ঘটনাবহুল দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন আরও কয়েকজন জনজাতি যোদ্ধা। স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে তাঁদের নাম অবশ্যই স্মর্তব্য।

১৮৬৫ সাল নাগাদ মধ্যপ্রদেশের নিমার অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন 'ভারতের রবিনহুড' নামে খ্যাত, দরিদ্রের বন্ধু, তিরন্দাজি, লাঠি চালনা ও গাদাবন্দুক চালনাতে দক্ষ তাঁতিয়া ভিল। ব্রিটিশদের বশংবদ জমিদার ও মহাজনদের নাক-কান কেটে নিতেন তাঁতিয়া ভিল। বাঙ্গলার রঘু ও বিশে ডাকাতের মতোই ব্রিটিশ শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁতিয়া ভিল। ব্রিটিশের বশংবদ মহাজনরা তাঁদের জমি দখল করলে বাধ্য হয়ে ডাকাতের জীবন বেছে নেন তাঁতিয়া ভিল। সবার কাছে আদরের 'মামা' নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। পুলিশ চৌকি বসিয়ে এবং ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও তাঁকে ধরতে পারেনি ব্রিটিশরা। ছদ্মবেশে পুলিশকে ধোঁকা দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৮৮৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দেয় তাঁতিয়া ভিলকে। তাঁর উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার অন্তর্গত পাতালপানি রেল স্টেশনে একটি মন্দির স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন— বীরসা মুণ্ডার জন্মতিথিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে পালন করা

হবে। এছাড়াও জনজাতি দেশপ্রেমিক নেতাদের স্মরণীয় অবদানকে সম্মান জানানোর জন্য সারা দেশে ১০টি সংগ্রহালয়ও গড়ে তোলা হবে। ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা, মেঘালয়ের খাসি জনজাতির প্রধান— ইউ তিরথ সিংহের সম্মানে শিলঙে একটি সংগ্রহালয় তৈরি করা হয়েছে। তবে বীরসা মুণ্ডার সম্পর্কে দেশের মানুষের আরও বেশি করে জানা উচিত বলে মনে করেন হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ভাঙ্গিয়া ভুকিয়া। বীরসার অনুগামীদের অনেকে বৈষ্ণব ছিলেন। আলোচিত হয়নি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রোহিল্লা জনগোষ্ঠীকে উদ্দীপিত করা রামজী গোণ্ডের অবদানও। জল, জঙ্গল, জমি অর্থাৎ প্রকৃতিকে মানব অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছিলেন জনজাতির মানুষরা। তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিবৃত্তে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাত্য হয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন তেলেঙ্গানার গোণ্ড ও কোয়া জনজাতির ইংরেজের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া কোমারাম ভীম। সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মৃত্যু হয় কোমারাম ভীমের। মণিপুরের রোং মেই জনজাতি নেত্রী রানি গাইদিনল্যুর কথাও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে আলোকিত হওয়া দরকার।

১৩ বছর বয়স থেকেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলেন রানি গাইদিনল্যু। মণিপুরের তামেংলং জেলার নুংকাও গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। তাঁর সম্মানে তাঁর গ্রামে একটি সংগ্রহালয় তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। উপজাতি সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন রানি গাইদিনল্যু। জওহরলাল নেহরু তাঁকে রানি অভিধায় বিভূষিত করেছিলেন।

'অন্ধ্রপ্রদেশের জনজাতি নেতা আল্লুরি সীতারাম রাজু। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রাম্পা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। স্থানীয় মানুষ তাঁকে উপাধি দেন 'মান্যম ভীরুডু' বা 'অরণ্যের নায়ক'। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের গুলিতে নিহত হন এই বীর সেনানী।

গোণ্ডজাতির জমিদার থাকার সময়ে ব্রিটিশ বাহিনী এবং তাদের পোষ্য মহাজনদের নির্মম নির্যাতনকে প্রত্যক্ষ করে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ছত্তিসগড়ের বীর যোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক বীর নারায়ণ সিংহ। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হলেও দেশীয় সিপাহিদের সাহায্যে কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হন তিনি। যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে নিহত হন তিনি।

কেরলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন কুরিচিয়া জনগোষ্ঠীর নেতা থালাক্কাল চান্দু। কেরলের একটি দুর্গ দখল করেন তিনি। তিন বছর ধরে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর নিহত হন থালাক্কাল চান্দু। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহের আরও একজন দুঃসাহসী নেতা ছিলেন বাবা তিলকা মাঝি। বিহারের এই যোদ্ধাটি ব্রিটিশদের পোষ্য 'দিকু' মহাজনদের সাঁওতালদের নিজস্ব ভূমি, ছোটনাগপুরের 'দামান-ই-কোহ' থেকে উৎখাত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিলকা মাঝির নেতৃত্বে ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোষাগার লুঠ করা হয়। ১৭৮৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন তিনি। ওই সময়ে ব্রিটিশ বুলেটে দেহাবসান ঘটে তাঁর। এভাবেই দেশের জনজাতির মানুষেরা ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে অসম লড়াইতে ভারতীয় মানসকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বারবার। এদেশ তাঁদের রক্তবিন্দুর কাছে কৃতজ্ঞ। □

দুর্বলদের জন্য বাপীদার কোচিংই ভরসা

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় ১৮১৩ সালে, যখন এক আইন জারি করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এদেশে শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বলে। একই সঙ্গে মঞ্জুর করা হয় এক লক্ষ টাকা। সেটাও এক বছরে খরচ করা যায়নি। থমাস মুনরো ১৮২২-এ প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সমীক্ষা করেন। এই প্রেক্ষাপটে রামমোহন রায়, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বা যাদবচন্দ্ররা যখন সন্তানদের শিক্ষিত করেছিলেন তখন জানতে ইচ্ছে করে তাঁরা নিজেরা কোথায় পড়েছিলেন? বলা যায় তাঁরা টোল মক্তবের মতো নামমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পেলেও মূলত ছিলেন স্বশিক্ষিত।

স্বাধীনতার পর বেশ কিছু সমাজসেবী ধনী লোকের উৎসাহ ও সরকারি সহায়তায় ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল গজিয়ে উঠলেও শিশু মৃত্যুর মতো স্কুল মৃত্যুর হার কমলো না। ফলে ১৮৬৬-তে নড়াইলের জমিদারদের গড়া বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুল, যেটি একদা কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী থেকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষায়তন ছিল তার অপমৃত্যু ঘটল। অনেকে বলে Good education must be non secular. সেই জন্য কিনা জানি না সেন্ট জেভিয়ার্স, ডন বস্কো, রামকৃষ্ণ মিশনগুলো হৃষ্টপুষ্ট ভাবে বেঁচে আছে।

আইএসআই-তে কোনো এক ঘরোয়া নরক গুলজারে অধ্যাপক অশোক মিত্র একদিন বলেছিলেন, বামফ্রন্টের সাতাশ বছরে রাজ্যে ৫২টি কলেজ হয়েছে তার মধ্যে ৪৯টি-তে ছাত্র সংখ্যা ২৫০ জনের কম। একটা কথা দিনের আলোর মতো সত্য— প্রাতস্মরণীয়দের কথা আমরা জানি তাঁরা সেরা স্কুলে অন্যতম গুণী শিক্ষকদের পেয়েছিলেন। সব শিক্ষকই যে অসাধারণ ডিগ্রিধারী ছিলেন এমন নয়। কিন্তু শিক্ষাদানে তাঁদের ফাঁকি ছিল না। নরেন্দ্রনাথ দত্তর বাবা সে যুগে প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসে যত টাকার ফি দিতেন সেটা তখন একটি পরিবারের সারা মাসের খরচ। তাঁর অকালমৃত্যুতে সেই খরচ না পোষাতে পারাটা নরেন্দ্রর স্কটিশ চার্চে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

এখন যেমন বরানগরে রামকৃষ্ণ মিশনের বদলে অনেকেই রামেশ্বর বা বরানগর বিদ্যামন্দিরে যায়। আমরা যারা ষাটের দশক জুড়ে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষালাভ করেছি তারা সেদিন বুঝিনি (বলা ভালো বোঝার বয়স হয়নি) যে স্বামী নিরন্তরানন্দ, শান্তিনাথানন্দ বা জমিদারনন্দন অকৃতদার বীরেন রায়রা ঘরের খেয়ে বা সন্ন্যাস জীবনযাপন করে বনের মোষ তাড়িয়েছিলেন বলেই আমরা জীবনে করে খেলাম। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত সরকার নির্ভরতা শিক্ষাকে সহজলভ্য করায় শিক্ষার গুণগত মান ক্রমহ্রাসমান হয়। Supply aheads demand মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠলেও অচিরেই প্রতিযোগিতার বাজারে এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় হারিয়ে যায়।

শিক্ষক নিয়োগ আগে করতেন শিক্ষামিত্র কর্মকর্তারা। গুণগত মানে তারতম্য থাকলেও শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে আপোশ করা হতো না। স্কুল কমিটি ও পরবর্তীতে নিরঙ্কুশ সরকারি উদ্যোগে এসএসসি প্রভৃতি গঠনের পর টাকার বিনিময়ে বাঁশরিতে পাখোয়াজ বাজানোর মতো ঘটনা একের পর এক উপদংশগুটিকার মতো প্রকাশ পাচ্ছে। সমস্ত শিক্ষা দপ্তরের কুশিলবরা আজ জেলবন্দি, স্যার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আজ আদালতের রায়ে অপসারিত। অন্য আর এক উপাচার্য জেলে।

অবস্থা যত না উদ্বেগের তার চেয়েও বেশি উদ্বেগের হলো এর উন্নতি না হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়োগ দুর্নীতির দরুন বাতিল হওয়া শিক্ষকরা সারদায় ক্ষতিগ্রস্তদের মতো কতটা নিষ্ক্রিয় থাকবে সেটা বলা কঠিন। তেমনি যারা শ্রীধরাচার্য বা পিথাগোরাসের নাম শোনেনি তাদের দিয়ে সেইসব কালজয়ীদের থিয়োরেম পড়ানোর বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন অধ্যাপক শিক্ষামন্ত্রী। সর্বোপরি আর্থিক ভাবে নিঃস্ব রাজ্য সরকার লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে বকেয়া মাগ্‌গিভাতা দেওয়ার ক্ষমতা যে নেই সেটা আদালতকে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে সামনের দিনে ধনীদের জন্য ডিএসপি, হেরিটেজ প্রভৃতি আর দুর্বলদের জন্য বাপীদার কোচিং-ই ভরসা। ▮

শাস্ত্রচর্চা গুরুত্বপূর্ণ তবে অস্ত্রটাও শাণিত হওয়া দরকার

উত্তম মণ্ডল

অনিবার্য ছিল না, কিন্তু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হয়েছে। এ নিয়ে এখনও বিস্তর চর্চা চলছে। আর যতই এ চর্চা চলছে, ততই ক্রমশ খুলে যাচ্ছে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতাদের মুখ ও মুখোশ। কেন ভারতকে টুকরো করা হলো? এর নেপথ্যের কারিগর কারা? আসুন দেখে নিই, চিনে নিই তাঁদের। তবে তার আগে কিছুটা ভারতের পরিচয় তুলে ধরা দরকার।

একথা ঠিক, গোটা ইউরোপ যখন ডুবে ছিল অশিক্ষার অন্ধকারে, বৈদিক ভারতের তপোবন থেকে ঋষিকণ্ঠে তখন ধ্বনিত হচ্ছিল—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' মানুষ অমৃতের সন্তান। এখানেই থামলেন না। ধর্মের উদার স্রোতের স্রষ্টা ঋষিরা আরও বলেন,—'যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্', অর্থাৎ যে যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন, তা দিয়ে ভগবানকেই পাওয়া যায়। ধর্মীয় হানাহানির এই দুঃসময়ে ঋষিবাক্য আজও সমান প্রাসঙ্গিক। হিমালয় থেকে সিংহল এবং পারস্য থেকে কম্বোডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের এই উদাত্তবাণী।

মহাভারত যুদ্ধের পর মৌর্যযুগে ভারতবর্ষ আবার এক অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পারস্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্য এবং এর ফলে ভারতবর্ষে এসেছিল মহাঐক্য। জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় চেতনায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের পিতৃসিংহাসনে বসেন এবং ২৭ বছর রাজত্ব করেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মগধের রাজা হলেন অশোক। এরপরের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অনুতপ্ত অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সে সময় রাষ্ট্রের আদর্শ হয়েছিল অহিংসা। ক্ষাত্রভূমি ভারতবর্ষে অস্ত্রচর্চা হলো উপেক্ষিত।

চতুর্থ অনুশাসনে অশোক ঘোষণা করলেন, --- 'ভেরী ঘোষ এখন পরিণত হয়েছে ধর্মঘোষে।' তার মানে, যুদ্ধবিজয় এখন ধর্মবিজয়ে পরিণত। এমনকী, অশোক তাঁর পুত্র-পৌত্রদের পর্যন্ত যুদ্ধ ছাড়তে বলেন। পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও চারুমতীকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন। অনেকে অবশ্য মহেন্দ্রকে অশোকের ভাই এবং সঙ্ঘমিত্রাকে বোন বলে থাকেন। যাই হোক, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা গিয়েছিলেন সিংহলে এবং চারুমতী যান নেপালে।

বিষয়টি বিতর্কিত হলেও একথা ঠিক, উত্তরে হিন্দুকুশ থেকে দক্ষিণে তামিল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়ে যায় অশোকের সময়েই আর এর জেরে ভারত সম্রাট অশোক হয়ে যান শুধুমাত্র 'মগধের রাজা।' একের পর এক প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে শুরু হয় বিভিন্ন বিদেশি হানাদারদের আক্রমণাত্মক অভিযান। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, এক সময় যে অন্ধ্র ও কলিঙ্গরাজাদের অবজ্ঞা করা হতো, পরে তাঁদের কাছেই পাটলিপুত্র ও রাজগৃহের মহামান্য সম্রাটদের নতজানু হতে হয়।

ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর এ সম্পর্কে বলছেন, নীতিগতভাবে সাম্রাজ্য বিজয় ধর্মবিজয়ে পরিণত হলো, আধ্যাত্মিকতার বিচারে তা মহত্তম হলেও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তা ছিল বিপর্যয়কর। ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট জানাচ্ছেন, হিন্দুরা গৃহযুদ্ধ, অন্তর্কলহে শক্তি ক্ষয় করেছে। জীবনযুদ্ধে সফল হবার জন্য যে তেজ ও উদ্যম দরকার, অহিংসাব্রত গ্রহণ করে তা নষ্ট করেছে। জাতীয় দুর্বলতার এই সুযোগ নিয়ে ভারত আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল সিথিয়ান, হুন, আফগান ও তুর্কি হানাদারের দল। এই অবস্থায় হিন্দুরা নিজেদের শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সীমান্ত, রাজধানী, ঐশ্বর্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়।

ভারতে এই যে অস্ত্রশস্ত্রের বদলে অহিংসার আদর্শে শান্তির ললিত বাণী প্রচারিত হলো, এর পিছনে রয়েছে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার্য এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্তরদায়িত্ব। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা ও প্রচারকরা যেমন অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন, তেমনি অদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রবক্তা শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' প্রচারের ফলে মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য উদাসীন হয়ে পড়েন। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার পড়ে না, তার চেয়ে বরং যা সত্য, সেই ব্রহ্মচর্চা করাই অপেক্ষাকৃত ভালো।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে বিন কাশিম যখন সিন্ধুদেশ দখল করে ভারতের মাটিতে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী, ঠিক তখনই শঙ্করাচার্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে অদ্বৈতবাদ প্রচারে ব্যস্ত। আবার খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজির সেনাবাহিনী যখন দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের বিধ্বস্ত করছে, তখন বৈষ্ণবাচার্য রামানুজম্ সেখানে নিশ্চিন্তে মানুষকে শাস্ত্রজ্ঞান দিচ্ছেন!

এই অবস্থায় যা হলো, তা ঐতিহাসিক উইল

ডুরান্টের ভাষায়,—'For four hundred years (600-1000 A.D.) India invited Conquest; at last it came.' অর্থাৎ চারশো বছর ধরে ভারত আহ্বান করে এসেছে বৈদেশিক আক্রমণকে; অবশেষে সত্যি সত্যিই সে এলো। এর কারণও খুঁজেছেন ঐতিহাসিক ডুরান্ট। তাঁর ভাষায়,—'The bitter lesson that may be drawn from this tragedy is that eternal vigilance is the price of civilization. A nation must love peace but keep its powder dry.' অর্থাৎ এই তিক্ত, বিয়োগান্ত, দুঃখজনক ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, অবিরাম সদাজাগ্রত অতন্দ্র প্রহরাই হলো সভ্যতার মূল্য। জাতি শক্তিকামী হবে অবশ্যই, কিন্তু সে কামানের বারুদও শুকনো রাখবে।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। শস্ত্রচর্চা ভুলে দার্শনিকদের দেখানো পথে শাস্ত্র হাতে বৈরাগ্য সাধনে মত্ত থেকেছে ভারত শাসকরা। আর এই অতিরিক্ত শাস্ত্রচর্চা করতে করতে ভারতীয়রা হয়ে ওঠে ভীষণরকম সংস্কারবাদী, যার ফলে পৌরুষের চর্চা ভুলে তারা নির্ভরশীল হয়ে উঠলো অদৃষ্টবাদের ওপর। অন্যদিকে, এই অদৃষ্টবাদ শক্তিহীন করে তুলেছে ভারতবাসীকে। সবকিছুই অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়েছে তারা। আর এর ফলে ঘটেছে ভারতের মাটিতে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ। ভারতীয়দের এই অতি নিষ্ক্রিয়তা উৎসাহিত জানিয়েছে বিভিন্ন বৈদেশিক হানাদারদের। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয় দিয়ে যার শুরু, শেষ '৪৭-এর দেশভাগে।

ভারতের বাইরের দিকে একবার তাকানো যাক। দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা যুদ্ধ ছাড়ার উপদেশ দেননি। ইসলামের অনুসারীরাও স্পেন ও ফ্রান্সের অধিকাংশ অংশ দখল করে নেয়। এরপর মহান পোপের আহ্বানে খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বে ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে টোরের (Taur) যুদ্ধে তারিকের ইসলামি বাহিনীকে পরাজিত করে। একই সময়ে আরব দস্যুরা ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু ফল হয় উলটো। বিদেশি আগ্রাসীরা কখনও বেয়নট, কখনও-বা তরবারি হাতে সাম্রাজ্য বিস্তারে বেরিয়ে পড়ে, তখনও ভারত অহিংসার বাণী 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'র মতো দর্শন শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, যার সর্বনাশা পরিণামেই একদা ক্ষাত্রশক্তিতে বলীয়ান ভারতবর্ষ হয়েছে পরাধীন। প্রথমে ইসলাম এবং পরে ব্রিটিশের অধীনে থেকে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে এ দেশের। আমরা ক্রমশ ভারত ভাগের উৎস থেকে মোহনার দিকে যাবো।

একথা সত্যি, প্রায় আটশো বছরের ইসলামি শাসন এবং তারপর প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনে থেকেছে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ। তারপর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিদায় নিল, দু'টুকরো হলো ভারতভূমি। বারবার প্রশ্ন ওঠে, এর জন্য দায়ী কে বা কারা? ভারত ভাগের ভাগীদারদের পরিচয় কী? ভারতের আরেক নাম হিন্দুস্থান। এখানকার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার এবং বিশ্বের সকল মানুষকেই ভেবেছে আত্মীয়—'বসুধৈবঃ কুটুম্বকম্।' তাই জাগতিক বিষয়ে হিন্দুস্থানের মানুষ থেকেছে উদাসীন। আর এই মানসিকতার জন্যই বার বার বিদেশি আক্রমণ ঘটেছে এ দেশে। ভারতের মাটিতে এঁকে দিয়ে গেছে কলঙ্কের চিহ্ন।

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার কারণে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গপ্রদেশে ঘটে নবজাগরণ। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় সারাদেশে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। তারপর এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চেহারা নেয়। আর এই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল হিন্দুদের সমর্থনপুষ্ট কংগ্রেস। ওদিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেনের হাতে তৈরি হয়েছিল ভারত ভাগের চুক্তিপত্র এবং তাতে স্বাক্ষর করেন ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি মুসলিম লিগ ও অমুসলমান ভারতীয়দের প্রতিনিধি কংগ্রেস। 'অমুসলমান ভারতীয়দের প্রতিনিধি' বলার কারণ হলো কোনো সরকারি দলিলে 'হিন্দু' শব্দটির ব্যবহার নেই। তাই বলা যায়, ভারত ভাগের ভাগীদার হিসেবে কংগ্রেস অবশ্যই দায়ী।

ভারতের মাটিতে বিজয়ীর বেশে একদিন ইসলাম এসেছিল। তারপর ব্রিটিশের হাতে

পরাজিত হয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির আমবাগানে তাদের রাজপাট চলে যায়। তাই সঙ্গত কারণেই ব্রিটিশের ওপর মুসলমানদের ক্ষোভ ছিল ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশদের হঠিয়ে পুনরায় তারা তাদের হারানো রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না জেনে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তারা ততটা উৎসাহ দেখায়নি। কারণ, তারা বুঝেছিল, ব্রিটিশ বিদায় নিলে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রাধান্যই ফের প্রতিষ্ঠিত হবে।

এর মধ্যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে হিন্দুদের অন্ধকারে রেখে মুসলমান তোষণ শুরু করলেন। এজন্য গান্ধী ও তাঁর ভক্তরা নতুন করে লিখতে শুরু করলেন, যা এককথায় ভারতের ভেজাল ইতিহাস। এই আবহে রাজনীতিবিদ থেকে 'ঐতিহাসিক' হয়ে গেলেন লালা লাজপৎ রায় এবং লিখলেন,—'The Hindus and Muslims have coalesced into an Indian people very much in the same way as the Angles, Saxons, Jutes, Danes and Normans formed the English people today.'

[The History and culture of the Indian People, Preface, XIII : R.C. Majumder.]

অর্থাৎ এঙ্গেল, স্যাক্সন, জিউট, ডেন ও নরম্যান জাতিগোষ্ঠীর মিলনে যেমন ইংরেজ জাতি তৈরি হয়েছে, তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই এক ভারতীয় জাতিসত্তায় লীন হয়ে গেছে। কিন্তু চমৎকার রাজনৈতিক এই স্লোগানটি আজও লালা লাজপৎ রায়দের সমানে বিদ্রূপ করে চলেছে!

আসলে বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতি নিয়ে ইংরেজ জাতি তৈরি হবার কারণ হলো, ওই সব উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকজন ছিল বিকাশের আদিম স্তরে। অন্যদিকে খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ছিল অনেক এগিয়ে। এঙ্গেল, স্যাক্সন, জিউট হলো জার্মান উপজাতি এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা বর্তমান ইংল্যান্ড জয় করে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এরপর সেখানে আসে ডেন ও নরম্যানরা। এদের মধ্যে অ্যাংলো স্যাক্সনরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরবর্তী সময়ে তাদের নাম অনুসারেই দেশটির নাম হয় এঙ্গেলল্যান্ড এবং তা থেকে ইংল্যান্ড। আর সে সময় ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক এবং তারা ছিল বহু দেবতায় বিশ্বাসী।

এরপর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ সময়ে সেখানে মিশনারিরা আসে সেখানকার অধিবাসীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে ধর্মপ্রচারকদের প্রায় চারশো বছর সময় লেগেছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয় ইংরেজ জাতির প্রথম মহাকাব্য 'বিওউলফ (Beowulf)। (**তথ্যসূত্র :** English Literature--- it's History and it's Significance : William J. Long.)। অথচ তার বহু আগেই ভারতে রচিত হয়ে গেছে ঋগ্বেদ।

ভারতে বহু বিদেশি জাতি এসেছে এবং তারা ভারতীয় জাতিসত্তায় মিশে গেছে, ব্যতিক্রম মুসলমানের ক্ষেত্রে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর কোথাও তারা মূল জাতিস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়নি। এমনকী, রাশিয়া ও চীনেও যা হয়েছে, তা হলো—'The conclusion can't be escaped that Muslims in the U.S.S.R. and China have neither been crushed out of existence nor assimilated beyond recognition.'---Discovering Islam, Page-116 : Akbar S. Ahmed.

অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা যায়নি; তারা (মূল জাতিস্রোতে) মিশে না গিয়ে নিজেদের আত্মপরিচয় বজায় রেখেছে।

এ বিষয়ে ঐতিহাসিক আয়েশা জালাল জানাচ্ছেন,—'All Muslims subscribe to the nakikita or sovereignty of Allah over the entire world. Together with the belief in the unity of God or Tauhid, the notion of divine sovereignty lies at the heart of the Islamic view of universal brotherhood. It offers ideological justfication for rejecting territorial nationalism and the separation of religion from politics.'---Self and Sovereignty, Page-188 : Ayesha Jalal.

অর্থাৎ বিশ্বের মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম সম্রাট হলেন আল্লা এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। এই দুটি বিশ্বাস হলো ইসলমের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিস্বরূপ। ধর্ম ও রাজনীতি ইসলামে অভিন্ন এবং মুসলমান যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস। আম্বেদকর বলেছেন, —"The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only...those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity...the allegiance of a Muslim does not rest on his homicile in the country which is his but on the faith to which he belongs...Wherever there is the rule of Islam, there is his own contry. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. This is properly the reason why Moulana Mohammed Ali, a great Indian but a true Muslim, preferred to be burried in Jerusalem rather than in India."

(Writtings and Speeches, Vol. 8, Page-330-331 : Dr. B.R. Ambedkar.)।

অর্থাৎ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন নয়। ইসলাম দুনিয়ার বাইরের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইসলামি দেশকেই মুসলমানরা নিজের দেশ মনে করে, সে দেশটির অবস্থান পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই হোক না কেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানরা কখনো ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি ভাবতে পারে না, তেমনি হিন্দুকেও আত্মীয় ভাবতে পারে না। এ কারণেই মৌলানা মহম্মদ আলি একজন স্বনামধন্য ভারতীয়, কিন্তু তিনি খাঁটি মুসলমান। তাই ভারতে নয়, জেরুজালেমে যেন তাঁর কবর হয়, এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।

মুসলমানের এই মজহবি অবস্থানের কারণেই রচিত হয় ভারত ভাগের পটভূমি। আর গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সর্বস্ব পণ করে শেষ পর্যন্ত হেরেছে। অনিবার্য হয়েছে ভারত বিভাগ। ভারতবাসী এখনও সেই দেশভাগের যন্ত্রণা ভোগ করছে। হ্যাঁ, এখনও। ▯

চুঁচুড়ার বিস্ময় প্রতিভা

দেড় বছরের ভ্রাজিষ্ণু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বয়স তার মাত্র ১৮ মাস। এই বয়স থেকেই দেশ-বিদেশের মহাপুরুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম গড়গড় করে বলে দিতে পারে চুঁচুড়ার ভ্রাজিষ্ণু ভট্টাচার্য। স্মৃতিশক্তি তাঁর প্রখর। যেকোনও জিনিস মাত্র একবার দেখেই মনে রাখতে পারে সে। আবার নতুন কোনও জিনিস দেখার পর পুরনো জিনিস ভুলেও যায় না। তাঁর এই বিশেষ প্রতিভার জেরেই ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস ও এশিয়া বুক অব রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে বিস্ময় শিশু ভ্রাজিষ্ণু।

চুঁচুড়ার কাপাসডাঙ্গা কলোনির বাসিন্দা দিলীপ ভট্টাচার্য ও কাকলির একমাত্র সন্তান ভ্রাজিষ্ণু। এই শিশু বয়সেই অবলীলায় প্রায় দু' হাজার ছবি দেখেই চিনতে পারে সে। বলে দেয় ছবির খুঁটিনাটি। কঠিন কঠিন দেশের নাম শুনে দেশটি কোথায় অবস্থিত খুব সহজেই গ্লোবে তা দেখিয়ে দেয়। ছেলের এমন বিস্ময়কর আইকিউ ধরে রাখতে বাড়ির দেওয়ালজুড়ে বিভিন্ন ফলফুল, পশুপাখি, নানা দেশের পতাকা, দেশ-বিদেশের মহাপুরুষ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের ছবি, মহাকাশ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষণীয় ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন তার বাবা-মা। মুখে ভালো করে কথা ফোটেনি ভ্রাজিষ্ণুর। অথচ তার মা তাকে কোলে নিয়ে কোনও ছবির সামনে দাঁড়ালে তখনই সে বলে দিতে পারে ছবিটা কার বা কী বিষয়ে।

ছোট্ট ভ্রাজিষ্ণুর বাবা দিলীপ ভট্টাচার্য পেশায় একজন ঘুড়ি বিক্রেতা। তিনি বলেন, ''বাবা হিসেবে খুবই গর্ববোধ হয় ওর জন্য। অনেকেই বলেছেন এত অল্প বয়সে এইরকম প্রতিভা দুর্লভ। ওকে আগলে রাখব। চারপাশে দেখি, অনেক প্রতিভাই অকালে নষ্ট হয়ে যায়। ছেলে যাতে তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ও যে এই বয়সেই দুখানা রেকর্ড বইয়ে জায়গা করে নিয়েছে, সেটা ভাবলেই ভালো লাগে।'' মা কাকলি ভট্টাচার্য গৃহবধূ। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন ভ্রাজিষ্ণুর এই প্রতিভা। তার পর তিনি

নিয়মিত নানারকম হোমওয়ার্কের মতো করে ছবি দেখিয়ে, তার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করেন।

কাকলিদেবী বুঝতে পারেন তাঁর সন্তান সাধারণ মেধার নয়। নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ মেধায় শান দিতে হবে। তিনিই গুগ্‌ল ঘেঁটে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর চুঁচুড়ার কাপাসডাঙ্গা কলোনির বাড়িতে এসে ভ্রাজিষ্ণুকে 'সর্বকনিষ্ঠ স্মৃতিধর' হিসেবে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে সম্মান জানানো হয়। শুধু তাই নয়, এইটুকু বয়সেই কারও সাহায্য ছাড়াই দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত পথ হাঁটতে পারে ভ্রাজিষ্ণু। তাঁর এই বিশেষত্বের খবরও ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। ১৮ মাসের শিশু জনবহুল রাস্তা দিয়ে কারও সাহায্য ছাড়াই একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ইউটিউবে সেই দৃশ্য ভাইরাল হয় মুহূর্তে। তারপর আসে আরও এক সম্মান। এবার অ্যাথলেটিক বিভাগে এশিয়া বুক অব রেকর্ডসে নাম ওঠে খুদে প্রতিভা ভ্রাজিষ্ণুর। মা কাকলি ভট্টাচার্য বলেন, ''ওর যা ভালো লাগে তাই করে। আমরা সবসময় চাই ও যেন নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। তবে আমার ইচ্ছে ও ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞানী হোক। এই বয়সের খ্যাতি যেন আগামীদিনে ওর মাথা না ঘুরিয়ে দেয় সেদিকে আমরা বেশি করে নজর দেব।''

ভ্রাজিষ্ণুর প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হচ্ছেন নেটিজেনরাও। প্রখ্যাত শিশু সাইকোলজিস্ট তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''শিশুদের মনে রাখার ক্ষমতা বড়োদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। তারা ছোটো থেকেই দেখে সবকিছু রপ্ত করে ফেলে। তবে ভ্রাজিষ্ণুর এত ছোটো বয়েসে ২ হাজারের বেশি ছবি এক পলকের দেখায় মনে রাখা সত্যি বিস্ময়ের।''

খুদে ভ্রাজিষ্ণুর বহুমুখী প্রতিভার যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তার জন্য সদা তৎপর ভট্টাচার্য দম্পতি। এখনও স্কুলের চৌহদ্দিতে পা রাখেনি এই চাইল্ড প্রডিজি। পরিবার থেকে শুরু করে পাড়াপড়শি সবাই চান একদিন বড়ো হয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে ভ্রাজিষ্ণু। □

অর্চির ম্যাজিক আংকেল

সে যাই হোক, যে যা বলুক, অর্চিবাবু কিন্তু খুব ভালো ছেলে। শুধু অঙ্কে আর ইংরেজিতে খুব কাঁচা। কিন্তু অর্চি এর মধ্যেই বুঝে গেছে, সে দাদার মতো পড়াশোনায় অত ভালো হতে পারবে না। সে চায়ও না। এটা তার বাবা-মা কিছুতেই বোঝে না। মাঝে মাঝেই বেধড়ক মার খায়। কিন্তু সে তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ফুটবল খেলা ছাড়তে পারবে না। বাড়িতে একমাত্র দাদাই তার সাপোর্টার, এই যা রক্ষে।

সেদিন অঙ্কের ক্লাসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অর্চি। আসলে ওর একদম অঙ্ক করতে ভালো লাগে না। তাই ও জানালা দিয়ে মেঘ দেখছিল। মেঘের মধ্যে সে ডোরেমনকে দেখতে পায়। সে আর ডোরেমন ফুটবল খেলছে। তাতেই মশগুল হয়ে পড়েছিল। খেয়ালই করেনি কখন থেকে টিচার ওকে ডাকছেন। কানে যখন হাতটা পড়ল তখন সংবিৎ ফিরল অর্চির। নীল আকাশের সেই মোহময় স্বপ্ন থেকে এক ঝটকায় একেবারে ধরায়।

— কী করছিলে অর্চিম্মান?

--- ওই সাদা মেঘের মধ্যে আমি ডোরেমনকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

সারা ক্লাস হো হো করে হাসছে। টিচার আর কথা না বাড়িয়ে সোজা বলে দিলেন, বাইরে গিয়ে নিলডাউন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।

ব্যাস, পরের দিন ডাক পড়ল অভিভাবকের। সন্ধ্যেবেলা আবার ধোলাই। সবকিছুই কেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে। আজকের টিফিনটা কেমন জঘন্য। মায়ের আজ বৃহস্পতিবারের পুজো। যা তা করে পাউরুটিতে জেলি-মাখন মাখিয়ে দিয়েছে। এত শক্ত যে দাঁত দিয়ে ছেঁড়াও যাচ্ছে না। অর্চি একটা বুদ্ধি করল। না খেলে তো আবার বকুনি। তাই পাউরটিটা ছিঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। স্কুলের গাছের তলায় একা বসেছিল অর্চি। হঠাৎ তার সামনে যেন এক আলোর বন্যা বয়ে গেল। সেই আলোর পথ ধরে মাথাভরা সাদা চুল আর গালভরা সাদা দাড়ি নিয়ে একজন তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার

হাতে বাটিভর্তি চাউমিন।

-- অর্চি, খেয়ে নাও। না খেলে পরের ক্লাসগুলো করবে কীভাবে?

-- কিন্তু আপনি কে?

আমি যেই হই, তুমি আগে খেয়ে নাও। তারপর তোমায় বলব আমার কথা।

অর্চির সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল। সে গপাগপ চাউমিন খেয়ে ফেলল। দাদার কথা মনে হলো। কিন্তু এখন তো দাদাকে ডাকা যাবে না। দাদাদের ক্লাস বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। পেটটা ভর্তি লাগছে আর মনটা আরামে ফুরফুর করছে।

— এবার বলুন, আপনি কে? আপনি কি হ্যারি পটার সিরিজের ডাম্বলডোরের মতো কেউ? যে অল্পেই মনের কথা বুঝতে পেরে মন যা চায় তাই এনে দেয়?

—আরে না না। তিনি তো শিক্ষক ছিলেন। আমি আলোর মানুষ।

—মানে?

—মানে খুব সোজা। যারা শুধুশুধু কষ্ট পায়, যাদের সঙ্গে অন্যায় হয় অথচ যারা মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না, আমি তাদের কাছে যাই। আমায় ঈশ্বর পাঠান। এই দেখো না, তোমার যেমন এখন খিদে পেয়েছে, খাবার এনে দিলাম।। আবার দেখ এর পরের ক্লাস করতে তোমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি সেটাও বুঝতে পারছি। কিন্তু ক্লাসটা তোমায় করতে হবে, তাতে তোমার মনে কোনো কষ্ট হবে না। দেখবে এক পলকেই যেন সবকটা ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। আর ছুটির পর তুমি একছুটে ফুটবল মাঠে চলে যাবে। শুধু মনে মনে আমার কথা চিন্তা করবে।

বাঃ, বেশ মজা হবে তো। মনে মনে ভাবল অর্চি।

—কিন্তু তোমায় মন দিয়ে ফুটবলটা খেলতে হবে।

—সেটাই তো আমি করি। সেটাই তো কেউ বোঝে না। আমি বড়ো হয়ে কত বড়ো ফুটবলার হবো, সেটা দাদা ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

—বুঝবে, আজ না হলেও একদিন বুঝবে। সারা স্কুল, সারা পাড়া, তোমার বাবা-মা সবাই বুঝবে।

অর্চির খুব আনন্দ হলো। সে আনন্দে নাচতে নাচতে ক্লাসে গেল। ক্লাস তখন শুরুই হয়নি। বন্ধুরা ওর পরিবর্তন দেখে জিজাসা করল, তোর মনে এত আনন্দ কেন রে? ওই যে ম্যাজিক আংকেলের সঙ্গে দেখা হলো তাই। সবাই বলে উঠল, সে কে রে? অর্চি কোনো উত্তরই দিল না। কিন্তু আজ রাতে দাদাকে সব বলতে হবে। অঙ্কের টিচার ক্লাসে ঢুকছে দেখেও অর্চির মনে কোনো কষ্ট, ভয় কিছুই হলো না। কারণ সে জানে ম্যাজিক আংকেল বলেছে সে একদিন খুব বড়ো ফুটবল খেলোয়াড় হবে। সেকথা ভেবেই অর্চির মন আরও একবার আনন্দে ভরে গেল।

আকাশ দেববর্মণ

ভারতের বিপ্লবী

দুকড়িবালা দেবী

দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। বিপ্লবীদের কাছে তিনি মাসিমা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙ্গলার প্রথম পর্যায়ের মহিলা বিপ্লবীদের অন্যতম। বিপ্লবী দলে যুক্ত হন নিজের বোনপো নিবারণ ঘটকের মাধ্যমে। আর বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির কাছে। নানাভাবে তিনি বিপ্লবীদের সহযোগিতা করতেন। রডা কেম্পানি থেকে বিপ্লবীদের চুরি করা মাউজার পিস্তল তিনি নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক রাতে তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে। কিন্তু কৌশলে তিনি সেগুলি অন্যত্র লুকিয়ে ফেলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার কর হয়। ১৯১৮ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭০ সালের ২৮ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গামে।
- তাঁর ছদ্মনাম অনিলা দেবী।
- তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে ৫০টি চলচ্চিত্র বিভিন্ন ভাষায় তৈরি হয়েছে।
- তাঁর দেবদাস বাংলা, হিন্দি ও তেলুগুভাষায় ৮বার তৈরি হয়।
- তাঁর সৃষ্টিসম্ভার হলো ঃ উপন্যাস-৩০, নাটক-৪, গল্পসম্পাদনা-২১, প্রবন্ধ-১১।
- তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলো শ্রীকান্ত।

ভালো কথা

ভালো মেয়ে

মৌমিতা দেবনাথ, সপ্তম শ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯

আমি একটি ভালো মেয়ে
সব কিছুতেই ভালো,
খেলতে ভালো পড়তে ভালো
নাচতে ভালো আঁকতে ভালো,
তবু কেন বোঝে না সবাই
আমি কত ভালো।

তবু মা,পিসি, কাকা
বলে আমায়বোকা।
যে যাই বলুক তবু
নিজের উপর বিশ্বাসটা রাখি
এমনি করেই সারাজীবন
যেন ভালো থাকি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

দাদুর ছাদবাগান

আমার দাদু বাগান করতে খুব ভালোবাসে। এবার দাদু আমাদের ছাদের টবে বেগুন, পালং, ধনেপাতা আর তার সঙ্গে চন্দ্রমল্লিকা ও গাঁদাফুল লাগিয়েছে। সবুজে আর ফুলে ভর্তি দাদুর ছাদবাগান। আমি আর বোন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দাদুকে সাহায্য করি। টবে জল দিই, গাছের পোকামাকড় তুলে ফেলে দিই। রবিবারে পাড়ার বহু মানুষ বাগান দেখতে আসে। দাদু কাগজে বড়ো বড়ো করে লিখে রেখেছে ' গাছ ও ফুলে হাত দেওয়া নিষেধ'। বেশিরভাগ মানুষ দাদুর প্রশংসা করলেও কেউ কেউ রাগ করে। কারণ যখন তখন ছাদবাগান দেখতে আসা দাদু পছন্দ করে না। আমার কিন্তু দাদুকে খুব ভালো লাগে। আমাদের দাদু খুব ভালো।

স্নেহাংশু কর্মকার, অষ্টম শ্রেণী, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

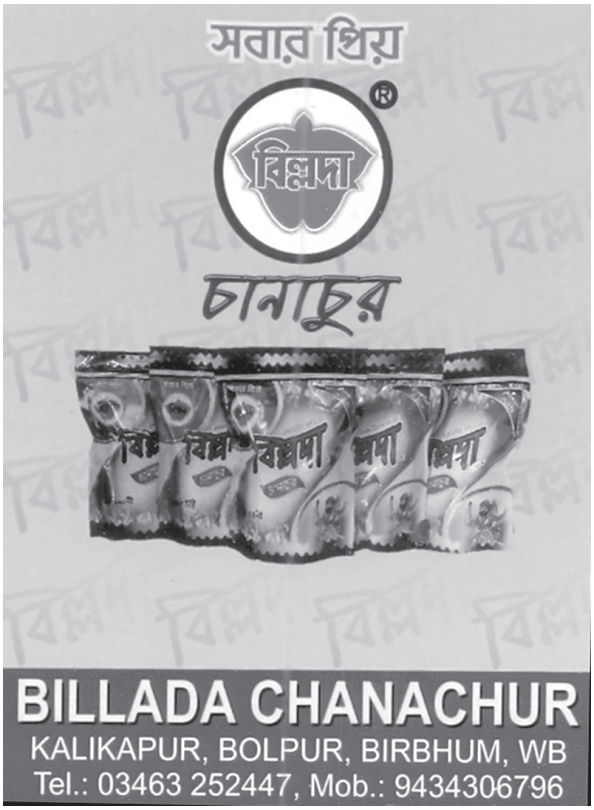

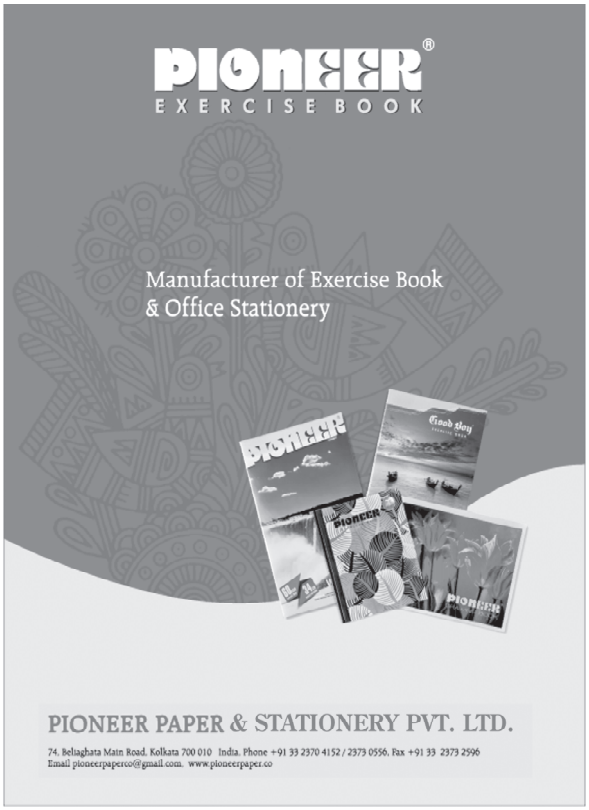

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাম জেহাদিদের তথাকথিত উত্তরপুরুষ তিতুমির

দীপক খাঁ

পশ্চিমবঙ্গে বাম জেহাদিদের পছন্দমতো মহাপুরুষদের আকাল পড়েছে বহুদিন ধরেই। তারা তাঁদের বশংবদ ঐতিহাসিক বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে আদ্যোপান্ত জেহাদি তিতুমিরকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়ে বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করে ইতিহাসের পাতায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। রাজ্যের সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলিকে ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয় প্রতি বছর ২৭ জানুয়ারি তিতুমিরের জন্মদিন পালনের জন্য। তিতুমির ইংরেজ তাড়াতে বাঁশের কেল্লা তৈরি করে লড়তে যায়নি। চেয়েছিল ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বাঙ্গলাকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে।

আর এই জেহাদেই তাঁর মৃত্যু হয়, তাই তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী অভিধায় ভূষিত করার জন্য বাম-সেকুলারদের কী অপরিসীম চেষ্টা! তাঁর স্মৃতিতে 'বাঁশের কেল্লা' নামে প্রতিবেশী বাংলাদেশের জামাত গোষ্ঠীর একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গিরের আমলে শাহরুখ আহম্মদ শিরহিন্দি নামের এক ইসলামি কট্টরপন্থীর উদ্ভব ঘটে, যে নিজেকে 'মুজাদ্দিদে আলফে সানি' বলে দাবি করে। ভারতে আগত ইসলাম বহু ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে তাঁর আদিরূপ ধরে রাখতে পারেনি। বহু হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিতে হয়েছিল ইসলামকে। ফলে মরু-আরবের ইসলাম আর গঙ্গা-গোদাবরী বিধৌত ভারতের ইসলামের মধ্যে একটা বড়ো ধরনের ফারাক তৈরি হয়। প্রচণ্ড হিন্দু বিরোধী আহম্মদ শিরহিন্দি ভারতের এই ইসলামকে স্বীকার করেনি।

মুঘল শাসনের অবসানে উদ্ভব হয় আরেক কট্টরপন্থী। তার নাম শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলভি। হিন্দুদের দমন করে দেহলভি ভারতকে পরিণত করতে চাইল 'দারউল ইসলামে', কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব পড়ল আরেক কট্টরপন্থী সায়িদ আহমদের উপর। জেহাদি সংগঠন তৈরি করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিশ্বজুড়ে আল্লার রাজত্ব কায়েম করার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল এই ইসলামি মোল্লা। সে যে আন্দোলন শুরু করেছিল ইতিহাসে 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, উপমহাদেশে দারউল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বালাকোটের যুদ্ধে নির্মমভাবে মৃত্যু ঘটে।

এই সায়িদ আহমেদ বেরলভি যখন হজযাত্রার উদ্দেশে কলকাতায় আসেন, তখন বহু মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই শিষ্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বারাসাতের মির নিসার আলি ওরফে তিতুমির। যৌবনে নদীয়ায় এক হিন্দু জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারে কারাদণ্ড ভোগ করে। কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষে যশোহর জেল থেকে বেরিয়ে সে 'তাবিকায়ে মুহম্মুদিয়া'য় যোগ দেয়।

তিতুমিরের উদ্ভবের আগে উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশে একটি মিশ্র সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বিরাজ করত। হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রার মধ্যে কিছু অমিল থাকলেও তার উগ্রতা ছিল না। গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যে জেহাদি মানসিকতা একেবারে ছিল না। ফলে আচার-আচরণ হিন্দুদের মতোই মানবিক ছিল। ছোটো ধুতি, কাঁধে গামছা এই ছিল গ্রামের সাধারণ মুসলমানদের পোশাক। দাড়ি রাখা বা না রাখার বাছবিচার ছিল না। তাদের নামগুলি হিন্দুদের মতো। যেমন পুরুষদের নাম— দায়েম, কায়েম, সাজন, দানেশ, শেহেজান, শিহাম, মধু এবং মেয়েদের নাম বাতাসী, কুড়ানী, শারী, শোভানী ইত্যাদি। মুসলমানরা নামাজ পড়ত ঠিকই তবে আরবি শব্দের অর্থ না জেনেই।

তিতুমিরের উদ্ভব হলে ওয়াহিবদের নিয়ে দল গঠন করে স্থানীয় মুসলমানদের বাধ্য করে নাম পরিবর্তন করতে আর আরবীয়দের মতো জোব্বা পরতে, দাড়ি রাখতে। ধুতির বদলে 'তাহ্‌বান্দ' নামে এক ধরনের কাপড় পরতে শুরু করে। স্থানীয় মুসলমানরা মহরমের দিনে স্থানীয় দরগাতে 'নজর' দিত। তিতুমিরের অনুগামীরা এসবের বিরোধিতা করত। তারাগুনিয়া গ্রামে একবার তিতুমিরের অনুগামীরা মহরম অনুষ্ঠানে বাধা দেয় এবং দরগায় লাথি মারে। এ ঘটনায় স্থানীয় মুসলমানরা নালিশ জানায় জমিদারের কাছে। এর ফলে জমিদারের সঙ্গে তিতুমিরের সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষ থামাতে হস্তক্ষেপ করল ইংরেজ সরকার। মামলা হলো তিতুমির ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। ফলে হিন্দুদের মতো ইংরেজ সরকারও তিতুমিরের বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে গেল। তিতুমিরের শত্রু ছিলেন পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগোনিয়ার রাজনারায়ণ, নাগপুর নিবাসী গৌরীপ্রসাদ চৌধুরী এবং গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়।

যুদ্ধ শুরু হলে।

(১) সেপ্টেম্বর ১৮৩১ সাল : বারাসাত জেলার বাদুড়িয়ার অন্তর্গত নারকেলবেড়িয়া গ্রাম। ৫০ বিঘা নিস্কর জমির মালিক মৈজুদ্দিন বিশ্বাসের জমিতে অজস্র বাঁশ দিয়ে বুরুজ তৈরি হলো।

(২) ২৩ অক্টোবর, ১৮৩১-এ এক বিরাট ওয়াজ জিহাদ ঘোষণা করা হলো। প্রাথমিক লক্ষ্য ব্রিটিশ শাসন ও হিন্দু জমিদারের উচ্ছেদ, কারণ শরিয়ত বিপন্ন। ২৩ অক্টোবর ১৮৩১ থেকে ৬ নভেম্বর ১৮৩১ পর্যন্ত জেহাদিরা কেল্লাতেই আটকে থেকে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল।

(৩) ২৮ অক্টোবর, ১৮৩১-এ বসিরহাটের দারোগা বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানালেন জমিদার কৃষ্ণদেবের এলাকায় তিতুমিরের অনুগামীরা গোহত্যা করে চলেছে।

(৪) ৬ নভেম্বর, ১৮৩১-এ পুড়ারবাজদর ৫০০ জন জেহাদি তিতুমিরের প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মহেশ চন্দ্র ঘোষের একটি গোরু ছিনিয়ে নিয়ে মন্দিরের সামনে জবাই করে বিগ্রহে গোরক্ত মাখায়। গোরুটিকে চার টুকরো করে পুড়ার বাজারের চারকোণে টাঙিয়ে দেয়।

(৫) ৭ নভেম্বর ১৮৩১-এ ইছামতীর অপর পারে পৌঁছে জেহাদিরা দুটি ষাঁড় জবাই করে ভোজ করে। তারপর তাদের আক্রমণে লাউহাটি বাজারে নিহত হন জমিদার পুত্র দেবনাথ রায়। ফকির মিসকিশাহ এই জয়কে আল্লার জয় ঘোষণা করে। তিতুমির ঘোষণা করে সে দারউল ইসলামের ইমাম। তাঁকেই খাজনা দিতে হবে। জোর করে তোলা আদায় শুরু হলো।

(৬) ১৪ নভেম্বর ১৮৩১-এ শেরপুর গ্রামে ইয়ার মহম্মদের বাড়ি আক্রমণ করে তিতুমির বাহিনী। ইয়ার মহম্মদের বিধবা কন্যা মুক্তবকে জোর করে নিকাহ করে তিতুমির অনুগামী মহিবুল্লা। কনিষ্ঠা কন্যা খুরমাকে অপহরণ ও নিকা করে কালুমিয়া।

(৭) ১৬ নভেম্বর, ১৮৩১-এ ইন্ডিয়া গেজেট লিখে, রামচন্দ্রপুর গ্রামে হিন্দুদের মুখে জোর করে গোমাংস গুঁজে দেওয়া হয়। এবার আলেকজন্ডার সাহেব তিতুমিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। বসিরহাট থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তীকে অপহরণ করে গোলাম মাসুম। বাঁশের কেল্লার মধ্যে হত্যা করা হলো তাকে ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায়। প্রথম দফার যুদ্ধে আলেকজান্ডার পরাজিত হলেন।

(৮) ১৯ নভেম্বর, ১৮৩১-এ আলেকজান্ডার, সাদারল্যান্ড ও ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে ইংরেজ সৈন্য। এক ইংরেজ সৈন্য মেক্কানকে হত্যা করে তার দেহ বল্লমে গেঁথে সামনে রেখে গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করে তিতুমির-বাহিনী। তিতুমির-সহ ৫০ জন জেহাদি নিহত, আহত ৩০ জন, ২৫০ জন জেহাদি ইংরেজদের হাতে বন্দি হলো। ইংরেজদের পক্ষে হতাহত হয় ১৭ জন।

জেহাদিদের বিচারের পর গোলাম মাসুমের মৃত্যুদণ্ড হলো, একুশ জনের যাবজ্জীবন কারাবাস, ৯ জনের সাত বছরের, আর বাকি ৯ জনের ছয় বছরের, ১৬ জনের পাঁচ বছরের, ৩৪ জনের তিন বছরের, ২২ জনের দু' বছরের কারাদণ্ড হয়। বাকিদের নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফটিক নামের এক হিন্দুকে কেল্লা থেকে ধরা হয়েছিল, মানসিক ভারসাম্যহীন বলে সেও মুক্তি পায়। গোলাম মাসুমকে জনসমক্ষে বাঁশের কেল্লার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ভাবে বাঙ্গলার বুকে শরিয়ত চালু করার চক্রান্ত নির্মূল হলো। অথচ বাম-সেকুলার বুদ্ধিজীবী ঐতিহাসিকদের বদান্যতায় এই জেহাদি জঙ্গি তিতুমির আজ পেয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা। ▯

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বিশ্ব মানচিত্রে টিকে থাকবে কিনা পাকিস্তানকেই ঠিক করতে হবে

কৃষ্ণচন্দ্র দে

পাকিস্তানে পঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক হামলা পাকিস্তানের রাজনীতিকে কোন কৃষ্ণগহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে একটু আলোকপাত করতে চাই। পাকিস্তানের রাজনীতি আবর্তিত হয় ভারতবর্ষকে একরকম টার্গেট করেই। কথাটা একটু খোলাখুলিই বলি পাকিস্তানে জনপ্রিয় নেতা হতে গেলেই সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন সেটা পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের অন্ধ ভারত-বিদ্বেষ, ভারতের বিরুদ্ধে যে যত বেশি মুখ খুলবে বা গ্লাডস্টোন বা ড্রিসোলর মতো অপপ্রচার মিথ্যার বেসাতি করতে পারবে সে বা তিনি তত বেশি জনপ্রিয় হবেন। তাই পাকনেতাদের মধ্যে সর্বদা একটা কমপিটিশান চলে, কে বেশি ভারত বিরোধী বিষ উগরে দিতে পারেন। স্বাধীনতার পর থেকে কোনোদিন পাকিস্তানে গণতন্ত্র বলে কিছু ছিলই না। সবসময় প্রশাসন চলতো মিলিটারি এবং আইএসআই-এর অঙ্গুলি হেলনে। নির্বাচিত একটা সরকার নামকা ওয়াস্তে অবশ্যই ছিল, তবে সেটা ছিল পুতুল সরকার। বিশ্ব রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারবারিরা বা বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো সবটাই জানে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সব দেখে বুঝেও চুপচাপ থাকে।

সন্ত্রাসবাদ কখনও কোনো দেশের রাষ্ট্রনীতি হতে পারে না। পাকিস্তান জেনেবুঝেই মোল্লাবাদ তথা সন্ত্রাসবাদকে আঁকড়ে ধরে আছে সেই জন্মলগ্নের পর থেকেই। সেইজন্য তাকে মূল্যও দিতে হয়েছে হাড়ে হাড়ে। কিন্তু কিছুই শিক্ষা নেয়নি। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে এবং ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে পাকিস্তান কোনো না কোনো বৃহৎশক্তির মদত পেয়ে এসেছে বরাবর। বর্তমানে চীনকে দোসর করেছে। চীনই এখন ওদের ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। চীনের ভেটো দেওয়ার কারণেই পাকিস্তান আজও সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে ঘোষিত হতে পারেনি। প্রত্যেকে শুধু নিজেদের স্বার্থেই পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে মদত দিয়ে চলেছে।

ভারত বহুদিন ধরেই প্রচুর চিৎকার-ধিক্কার-চেঁচামেচি করে চলেছে। বিশ্বদরবারে হাজারো প্রমাণ দাখিল করেও কোনো ফল হয়নি, কিন্তু যেই মাত্র আমেরিকার নিজের ঘরে আগুন লাগলো, সেই ১১ সেপ্টেম্বর, তখনই ঘুরে দাঁড়ালো এবং কিছুটা সবক শিখলো। এখন তো অনেকেই ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান ১৯৪৮-এ থাপ্পড় খেয়েছে। তবু শিক্ষা নেয়নি। ১৯৬৫ সালে আবার থাপ্পড় খেয়েছে, শিক্ষা নেয়নি, ১৯৭০-৭১ সালে তো ঢাকি সুদ্ধ বিসর্জন হলো, তবুও শিক্ষা নেয়নি। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় মূর্খরা কোনোদিনই ধর্মের কথা শোনেনি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে

গুলি-বন্দুক ও প্রাণঘাতী হামলা একটা যেন গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। এক সঙ্গেই দুটি দেশ স্বাধীন হলেও এপারে যখন স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব, ওপারে তখন হকিকি আজাদিমার্চ। জেনারেল জিয়াউল হক থেকে পারভেজ মোশারফের আমল পর্যন্ত বারে বারে ফিরছে সেনা অভ্যুত্থান ও ফৌজিশাসনের অন্ধকার দিন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিখানকে গুলি করে হত্যা করা হয় স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পরেই। সেই থেকে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে জিন্নাসাহেবের তথাকথিত পবিত্র মাটি। কখনও সেনা অভ্যুত্থান কখনও জঙ্গি হামলা অশান্ত করেছে পাকিস্তানের আকাশ, তার আঁচ এসে পৌঁছেছে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে। অতি সম্প্রতি আমরা দেখলাম হুবহু বেনজির ভুট্টোর হত্যারই রিপিট টেলিকাস্ট। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইমরান খান আক্রান্ত। কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছেন। জুলফিকারআলি ভুট্টোর কথা তো সবার জানা। তবে এটা সত্যি যে এই ঘটনা পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে কিছুটা হলেও ঝড় তুলে দিয়েছে।

অশান্ত পাকিস্তান কোনোদিনই ভারতের পক্ষে শুভ নয়। পাকিস্তান যত রক্তাক্ত হবে ততই দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের হাতে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান যে নতুন করে ভারতের পক্ষে বিপদ ডেকে আনবে না, সেটা কে বলতে পারে? পাকিস্তানে রাজনৈতিক ভাবে একটি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল সরকার বিশেষ ভাবে দরকার। এতে শুধু পাক জনগণের কল্যাণই হবে তা নয়, এই উপমহাদেশের কল্যাণের জন্যও দরকার। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝবে ততই মঙ্গল। এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে ভারতে যতটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যতটা বিকশিত হয়েছে পাকিস্তানে তার ছিঁটেফোঁটাও হয়নি।

অসামরিক নাগরিক জীবনের প্রসার রুদ্ধ হওয়ার কারণেই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক প্রসার রুদ্ধ হয়েছে বারেবারে। এখনও সে দেশে নির্বাচিত কোনো সরকারের প্রধান নিয়ন্ত্রক চারটি স্তম্ভ— সেনাবাহিনী, আইএসআই, সেনা

ভারতের ১৩৫ কোটি মানুষ যদি একবার শুধু ফরোয়ার্ড মার্চ করে, তাহলেই পাকিস্তানের খেল খতম। এটা পাকিস্তান যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল। পাকিস্তানকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিশ্ব মানচিত্রে সে টিকে থাকবে না মুছে যাবে।

মদতপুষ্ট কট্টর জঙ্গি সংগঠন এবং অতি সক্রিয় বিচার ব্যবস্থা। এই চার নিয়ন্ত্রকের টানাপোড়েনেই বারবার রক্তাক্ত হয়েছে পাকিস্তানের মাটি। গণতন্ত্র ও নির্বাচনে জয়ী সরকারের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার অর্থই দেশে ফৌজি শাসন কায়েম হওয়া। বেনজির ভুট্টোকে কারা খুন করলো তার নিষ্পত্তি আজও হয়নি। জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল জেনারেল জিয়াউল হকের ফৌজি জমানায়। বিচারের প্রহসন করে জেনারেল জিয়া ভুট্টোসাহেবকে ফাঁসিতে চড়িয়েছিলেন। সেই ট্রাজিশন আজও চলছে। তাই নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, নির্ভেজাল নারী স্বাধীনতা জিন্নার দেশে সোনার পাথর বাটি।

অথচ একই সময়ে স্বাধীন হওয়া দুটি দেশ যদি পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতো, ভাবের আদান প্রদান, নাগরিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো নির্মাণে পরস্পর সহযোগিতা-সহ নিজ নিজ সীমান্ত রক্ষায় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে কূটনৈতিক সম্পর্কে হৃদ্যতা এনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতো, তবে বিশ্ব মানচিত্রে এবং রাজনীতিতে একটা জায়গা করে নিতে অনায়াসেই পারতো। ভারতের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো কসুর ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান কখনও ভারতের ডাকে সাড়া দেয়নি। বরং আদাজল খেয়ে অন্ধ ভারত বিরোধিতা ও কট্টরপন্থীদের মদত দিয়ে গরিব ঘরের ছেলেদের সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দিয়ে কাশ্মীর সীমান্তকে অগ্নিগর্ভ করে তুলছে প্রতিনিয়ত। পাকিস্তানের রাজনীতিতে টিকে থাকার এটাও নাকি এক শর্ত। পাকিস্তান বুঝতেই পারছে না, ভারত-পাকিস্তান যদি একজোট হয় তবে দুই দেশের মিলিত শক্তিকে সারা বিশ্ব সমীহ করতো। এই উপমহদেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

মহাশক্তিধর দেশগুলি তা চায় না, এটা ভারত যেমন বুঝতে পারে পাকিস্তানও বোঝে। তথাপি তারা সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভারতের দিকেই অস্ত্র তাক করে আছে। সর্বত্রই একটা ছায়াযুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করে রাখতে সমানে তৎপর হয়ে আছে। এর ফল কোনোদিনই ভালো হবে না, ভালো হতে পারে না। দুই দেশের পক্ষেই তা ক্ষতিকর। একশো পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের এই মহান দেশ ভারত যদি একবার শুধু ফরোয়ার্ড মার্চ করে, তবে তো খেল খতম, পয়সা হজম। এটা পাকিস্তান যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই তার মঙ্গল। পাকিস্তানকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিশ্ব মানচিত্রে সে টিকে থাকবে না মুছে যাবে।

পাকিস্তানের আমজনতা কখনই সন্ত্রাস চায় না। এমনিতেই তারা জঙ্গি দৌরাত্ম্যে ও ফৌজি বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ। কোভিডের আঘাতে সে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও অন্যান্য খরচ মেটানোর বিদেশি মুদ্রা হাতে থাকবে কিনা ত নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে। তার উপর সাম্প্রতিক বন্যায় দেশটা আরও লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। এই পটভূমিতে ইমরান খানের উপর গুলি বর্ষণে দেশটা আবার অশান্ত হয়ে উঠলে তা পাকিস্তানের জনগণের কাছে কোনও ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে না। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক হাসপাতাল থেকেই যে ভঙ্গিতে তর্জনী তুলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার বিরাট প্রভাব পড়বেই।

মালদা সীমান্তে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মালদা জেলার মহদিপুর ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। যদিও আমদানির চাইতে রপ্তানিই হয় বেশি। পণ্যের মধ্যে ছোটো পাথর বা স্টোন চিপস বেশি রপ্তানি হয়। মহদিপুর বর্ডারে কাস্টমস্ এবং বিএসএফের নজরদারিতে পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়। প্রতিদিন প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ গাড়িতে এদেশ থেকে পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। অভিযোগ, এখানেই কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কাস্টমস্ অফিসারের মদতে দেশের রাজস্ব কোষাগারে জমা না পড়ে তাদের নিজস্ব পকেটে চলে যাচ্ছে। মহদিপুর কাস্টমস্ অফিসে যারা রান্না, বাসনমাজা, বাগান পরিষ্কার ও ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করেন তাদের প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক লরি বা ট্রাক রয়েছে। এদের গাড়িতেও বাংলাদেশে মাল রপ্তানি করা হয়। কিছু অসাধু কাস্টমস অফিসার গাড়ি চেকিং করার সময়ে এই সমস্ত কাজের লোক ও রাধুনিদের দিয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি করান এবং স্যাম্পলের নাম করে পাথরের স্থানীয় গাড়ি এবং বাইরের মালিকের গাড়ি থেকে প্রচুর মাল নামিয়ে নেয়। পরে সেই পণ্য রাতের অন্ধকারে পাচার করা হয়।

ফলে এক্সপোর্টাররা কাস্টমসে অভিযোগ করলেও লাভের লাভ কিছু হয় না। এছাড়াও গাড়িতে ওভার লোডের টাকাও অফিসারদের পকেটে যায়। আর একটি ঘটনা জেলা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে মহদিপুর বর্ডারে চেকপোস্টে ঘটে চলেছে। সেটি হলো, চেকপোস্টের জিরো পয়েন্টে সরকারি অফিসারদের তত্ত্বাবধানে মহদিপুর 'প্রিভেন্টিভ ইউনিট' বলে একটি অফিস রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে কোনো সরকারি কর্মকর্তা থাকেন না। বেসরকারি কয়েকজন ব্যক্তি এখানে দেখাশোনা করেন। যার ফলে গাড়ির মধ্যে ড্রাগ, মাদক দ্রব্য কিংবা বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির একটি সম্ভাবনা থেকেই যায়।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিএসএফের প্রচেষ্টায় এরকম একটি কাঁচা মালের গাড়ি থেকে বেশকিছু গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছিল, যেটি পাচারের জন্য লুকিয়ে রাখা ছিল। অভিযোগ, অসৎ কিছু কাস্টমস অফিসার ও দালাল চক্রের মাধ্যমে বিএসএফ এবং সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অতিরিক্ত কিছু ট্রাক বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে যার হিসেব সরকারি ভাবে রাখা হয় না। যার ফলে সরকারি কোষাগারে টাকা না ঢুকে দুর্নীতিবাজ কাস্টমস ও স্থানীয় মাফিয়াদের পকেট ফুলে ফেঁপে উঠছে। এছাড়াও টাকা পয়সার লেন-দেনে গণ্ডগোল হলেই স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি দলবল নিয়ে মাঝে মধ্যে কাস্টমস্ অফিসে এসে অফিসার ও সুপারেন্টেনডেন্টকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দিয়ে থাকে। একটি সরকারি অফিসে এসে হুমকি ও গালিগালাজ দেওয়ার সাহস কোথা থেকে পায়, এটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। অন্যদিকে জেলা প্রশাসন এইসব অবাঞ্ছিত লোকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা না নেওয়াতে টাকা পয়সা নিয়ে অবৈধভাবে গাড়ি ঢোকানো এবং বেআইনি কাজকর্ম ও দুর্নীতি চক্রকে বাগে আনতে পারছে না প্রশাসন।

এদিকে বেশ কিছুদিন আমদানি রপ্তানি বন্ধ এবং ট্রাক প্রতি আলাদা করে টাকা নেওয়ার জন্য স্থানীয় ট্রাক মালিকরা বর্তমানে বিপাকে পড়েছেন। সব গাড়িতে মাল লোড করতে দেওয়া হচ্ছে না। আগে যেখানে ১৩ থেকে ১৪ হাজার ট্রাক পণ্য পরিবহণ করতো, এখন সেখানে মাত্র তিন হাজার ট্রাক এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন ঘুরে ফিরে চালাচ্ছে। বাকি গাড়িগুলি সব বসে রয়েছে। আগে যেখানে টন প্রতি মাল ভাড়া ৮০০ টাকা ছিল এখন সেখানে হয়েছে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। এছাড়াও মালিককে গাড়ি প্রতি ৭০০ টাকা এবং পার্কিং চার্জ বেশি হওয়াতে এলাকায় ট্রাক মালিকদের মাথায় হাত পড়েছে। অনেকেই তাই কম দামে গাড়ি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই টাকাগুলি নাকি সরকারি ভাবে নেওয়া হচ্ছে। মাল নিয়ে সীমান্ত দিয়ে গাড়ি পারাপার করার সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা। আশঙ্কার বিষয় হলো, যেভাবে ঢিলেঢালা পদ্ধতিতে মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে আমদানি ও রপ্তানি করা হচ্ছে, তাতে জঙ্গি এবং আরডিএক্স এদেশে ঢুকে অস্থিরতা তৈরির সুযোগ পাবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। এই বিষয়টি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার বিবেচনা করা উচিত বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। ▯

প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের জন্য ব্যবসাশ্রয়ী রোগ নির্ধারক প্রযুক্তি উদ্ভাবন খড়্গাপুর আইআইটি-র সুমন চক্রবর্তীর

পিআইবি ॥ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা পর্ষদের জগদীশচন্দ্র বসু জাতীয় ফেলো অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। খড়্গপুর আইআইটি-র এই অধ্যাপক তাঁর গবেষক দলের সঙ্গে 'কোভির‍্যাপ' নামে একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এখানে নিউক্লিক অ্যাসিডের সাহায্যে কেউ কোভিড সংক্রমিত কিনা তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই প্রযুক্তিটি বিভিন্ন সংস্থাকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে যাতে তারা সহজেই কোভিড নির্ণায়ক কিট তৈরি করে এই রোগের মোকাবিলা করতে পারে।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর আরও একটি উদ্ভাবন হলো রক্তের শর্করা, হিমোগ্লোবিন, ক্রিয়েটিনিন ও কোলেস্টেরল-সহ লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের স্মার্ট ফোন-ভিত্তিক অ্যাপ। এক্ষেত্রে আঙুল ফুটো করে রক্ত নিয়ে সেই রক্ত একটি পেপার স্ট্রিপের ওপর রাখলেই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগুলি করা সম্ভব। এর ফলে, একেবারে প্রাথমিক স্তরে সংক্রমিত নয়, এ ধরনের অসুখ নির্ধারণ করতে সুবিধা হবে। মানুষের মুখে ক্যানসার হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে এই গবেষকের নেতৃত্বাধীন দল। উদ্ভাবিত এই যন্ত্রের মাধ্যমে মুখের মধ্যে কোষকলার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহের হারের সাহায্যে ক্যানসার হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন গবেষক দলের আরও একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো বিদ্যুৎ-রসায়ন সেন্সরের সাহায্যে রক্তের বিভিন্ন উপাদান নির্ধারণ করা। এছাড়াও, বর্তমান যুগে সব থেকে উদ্বেগজনক সমস্যাটিও শনাক্ত করার ক্ষেত্রে গবেষক দল একটি পেপার কিট উদ্ভাবন করেছে। ইদানীংকালে রোগ নিরাময়ের জন্য নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে রোগীর শরীরে আর অ্যান্টিবায়োটিকগুলি কাজ করে না। ফলে, চিকিৎসকদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উদ্ভাবিত পেপার কিটের সাহায্যে ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক রোগীর শরীরে কাজ করবে কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

গবেষক দলের আরও একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন হলো অনুঘটকমুক্ত পদ্ধতিতে রক্তাল্পতা নির্ধারণ। এক্ষেত্রে একটি ভিজে কাগজের ওপর লোহিত রক্ত কণিকা দিয়ে কারোর রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব। এইভাবে স্বল্প মূল্যের বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা রা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে হস্তান্তরিত করার ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি রোগ শনাক্ত করার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদন করছে। এর ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ গড়ে উঠেছে। তাঁর এই উদ্ভাবনের জন্য সম্প্রতি ইনফোসিস তাঁকে সম্মানিত করেছে।

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী জানুয়ারি ২০২৩-এ ১৮ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন। স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২৫।।

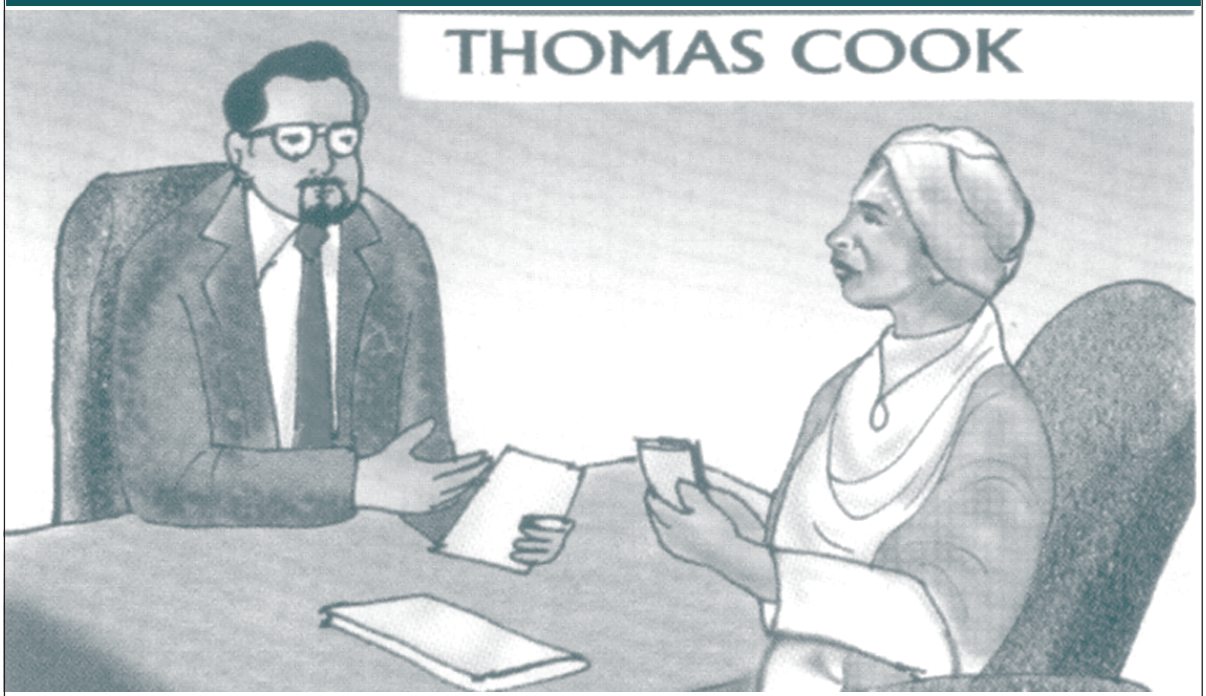

সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে Thomas Cook and Sons Company-তে এসে জানতে পারলেন বম্বে থেকে তাঁর নামে মানি অর্ডারে সাড়ে চারশো ডাকা কেউ একজন পাঠিয়েছেন। কে পাঠিয়েছেন নাম না থাকায় বোঝা গেল না। মহানামব্রতজী একে ভগবানের করুণা বলে মনে করলেন।

এই টাকায় নিউইয়র্ক পর্যন্ত যাবার টিকিট হবে। তবে তাঁর হাতে থাকবে মাত্র কুড়ি ডলার। ভারতীয় টাকায় মূল্য ষাট টাকা। এ কথা জেনে তাঁকে টিকিট দিতে চাইল না জাহাজ কর্তৃপক্ষ। সে দেশের আইনে কম করেও যাত্রীর কাছে একশো ডলার থাকলে তবে জাহাজে ওঠার অনুমতি পাওয়া যায়।

(ক্রমশ)